৪৩বর্ষ • ৩য় সংখ্যা • জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আমাদের কথা		
পুরনো সংখ্যা থেকে		২
দশাবতার ব্যাখ্যা	অনু: আশীষ লাহিড়ী	৪
করে দেখো ভালো লাগবে	শুভেন্দু দাশগুপ্ত	৭
মাতৃভাষা শিক্ষা	সৌরভ দাস	৮
ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	সমীরকুমার ঘোষ	১১
গো-গবেষণা	প্রদীপ দাস	১৩
পরিবেশ রক্ষা	শ্রেয়সী দাশগুপ্ত	১৫
জঙ্গলে ওজোন স্তর	নন্দগোপাল পাত্র	১৮
উত্তরবঙ্গের সংস্কৃতিচর্চা	তমোজিৎ রায়	১৯
মানুষ মানুষকে পণ্য করে	গৌতম মিস্ত্রী	২১
হোমিওপ্যাথি	সুব্রত রায়	২৪
জাফ্‌রুল্লা চৌধুরী	ভবানীপ্রসাদ সাহু	২৬
সৌমেন স্যার	দীপঙ্কর দে	২৮
পুস্তক পরিচিতি	গৌতম মিস্ত্রী	৩০
সংগঠন সংবাদ ও চিঠিপত্র		৩২

রেজিস্টার্ড অফিস : বি ডি ৪৯৪ সল্টলেক, কলকাতা- ৬৪

কার্যালয়

খাদিমস বিদ্যাকুট আবাসন

বি ৪, এস - ৩, নারায়ণপুর

পোঃ (আর গোপালপুর) কলকাতা- ৭০০১৩৬

ফোন : ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৮৯০২৪১২২৯০/৮৭৭৭০৬৬৪৭২

ওয়েবসাইট:www.utsomanush.com/

ই-মেল: utsamanush1980@gmail.com

ফেসবুক:http://www.facebook.com/utsomanush/

ISSN 0971-5800/RN.37375/80

আমাদের কথা

অতিমারীর আগেকার পরিস্থিতির সঙ্গে এখনকার সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা মেলানো যাচ্ছে না। মানুষের কষ্ট বেড়েছে, পারস্পরিক মেলামেশা যেটুকু ছিল তা আগের মতো নেই। দেশের মোট সম্পদের বেশিরভাগটাই ১০ শতাংশ বিত্তশালীদের হাতে। বেশ কিছু সরকারি সিদ্ধান্ত পুরো শিক্ষাব্যবস্থাকে গভীর সংকটের মুখে ঠেলে দিয়েছে। শিক্ষা ও বিজ্ঞান খাতে সরকারি ব্যয় বরাদ্দ বিশেষ না বাড়ার ফলে আর্থিকভাবে দুর্বল মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার যেটুকু সুযোগ ছিল তা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এই সুযোগে দেশের নীতি-নির্ধারকরা তাঁদের রাজনৈতিক লক্ষ্য স্থির রেখে নানান ভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যাতে করে যুক্তিবাদী চিন্তা, বিজ্ঞানমনস্কতাকে একই সঙ্গে নিকেশ করে দেওয়া যায়। সাম্প্রতিক উদাহরণ ডারউইন-এর বিবর্তনবাদ তত্ত্বকে স্কুল সিলেবাসের থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া। একইভাবে ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সিলেবাস থেকে বেছে বেছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার বাতিল করে সত্যকে

অঙ্কনশিল্পী : ঋতুপর্ণ বসু

ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। দেশব্যাপী এসবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও হচ্ছে। শিক্ষক ও ছাত্ররা তাতে সামিল হচ্ছেন। বিজ্ঞানের প্রমাণিত সত্যকে না মেনে আজগুবি গল্প বানিয়ে সেসবের পৃষ্ঠপোষকতা করতে আসরে নেমে পড়েছে মহাক্ষমতাধর ও তাদের স্তাবকবৃন্দ। আদম ও ইভ থেকে সমস্ত মনুষ্যসমাজের জন্ম হয়েছে, পৃথিবীটা বাসুকির ফণার ওপর দাঁড়িয়ে আছে —এই ধরনের বিশ্বাসকে যদি ধর্মের মূল অঙ্গ বলে স্বীকার করি, তাহলে শুধু ডারউইনের আবিষ্কার নয় সামগ্রিকভাবে বিজ্ঞানের সমস্ত আবিষ্কারকেই ভ্রান্ত বলে মেনে নিতে হয়। ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব আমাদের জানতে সাহায্য করে কিভাবে পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রজাতিগুলি দীর্ঘকাল ধরে একটু একটু করে পরিবর্তিত হয়েছে এবং তার নিশ্চিত প্রমাণ রয়েছে ফসিলের মধ্যে। প্রজাতিগুলি বিবর্তনের সময় কি কি ধাপ পেরিয়ে এসেছে তার ইতিহাস পাঠ করে কৌতূহলী ছাত্র-ছাত্রীরা আরো নতুন নতুন বিষয়ে জানতে আগ্রহী হবে। সেখানেই আঘাত দিতে চাইলে প্রতিবাদ তো হবেই। আমরা এই আগ্রাসী মনোভাবের তীব্র প্রতিবাদ করছি।

উ মা

উৎস মানুষ পত্রিকার পুরনো সংখ্যা থেকে — জানুয়ারি-মার্চ ১৯৮১ (৫)

কেমন ছিল সংখ্যাগুলি? তারই কিছু নমুনা তুলে ধরার প্রয়াস মূলত নতুন পাঠকদের কথা ভেবে। পত্রিকা প্রকাশের দ্বিতীয় বছরে (১৯৮১) প্রতিমাসে একটি করে বার্ষিক বারোটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। প্রতি সংখ্যা কুড়ি পাতা—পত্রিকার দাম ছিল এক টাকা। প্রথম তিনমাসের কিছু উল্লেখযোগ্য সংক্ষেপে তুলে ধরা হল।

দ্বিতীয় বর্ষ জানুয়ারি ১৯৮১র 'আমাদের কথা' (সম্পাদকীয়)— এপ্রিল-জুন, ২০২৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। এই পুরনো সংখ্যার আহরণে **'জাতীয়ও বিজ্ঞান কংগ্রেস (১৯৬১) প্রসঙ্গে'** সভাপতি নীলরতন ধরের মন্তব্য আজও সমান প্রাসঙ্গিক। কি বলেছিলেন তিনি? ...''১৯৬১ সালের ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণে আমি স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলাম, ভারতীয় দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান প্রবেশ করতে পারে নি এবং কাজে ও কথা আমাদের সততার ছোঁয়া নেই। ১৯৬০ সালে কোলকাতায় যখন এই ভাষণ ছাপার জন্যে পাঠানো হয় তখন অধ্যাপক পি রায়, ড. পি কে বোস ও অন্যান্যরা সেটা পছন্দ করেন নি এবং আমাকে অনুরোধ করেন যেন ঐ অংশটুকু ভাষণ থেকে আমি বাদ দিই; আমি আমার ছাত্র ও অন্যান্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে জানতে পারি তারা বাদ দেবার বিরুদ্ধে। আর তাই আমি ওই মন্তব্যগুলি বাদ দিতে গররাজি হই। রাজেন্দ্রপ্রসাদের সভাপতিত্বে আমার এই ভাষণের পর শ্রীমতি এস. আর. খাস্তগীর, ড. মিহির মুখার্জী, অধ্যাপক হুমায়ুন কবির ও অন্যান্যরা আমাক অভিনন্দন জানান।... সাধারণের মতে রুড়কী কংগ্রেসের সমগ্র অধিবেশন গত কয়েক বছরের মধ্যে সবচেয়ে ভালো হয়েছে। এমন কি সাধারণ সচিব ড. বি. সি. গুহর মতে মি. নেহেরুর অনুপস্থিতির উত্তেজনা ও বিশৃঙ্খলা রাজেনবাবুর উপস্থিতিতে এড়ান গেছে।''...

প্রশান্ত রায়ের **'কুসংস্কার ও শোষণ : সমাজবিজ্ঞানী ও সাধারণ মানুষ'** সম্পর্কে পর্যালোচনা— শোষণ মুক্ত সমাজ গঠনে কতটা জরুরি তারই একটি মূল্যায়ন। উপসংহারে বলা হয়েছে— ''অবশ্য এই পর্যালোচনার শেষে কখনোই বলা যাবে না যে কুসংস্কার নামক দৃঢ়বদ্ধ প্রস্তরটির আদৌ কোন অপসরণ হচ্ছে না কিম্বা এই বিষবাস্পের কোনরকম বিতাড়ন হচ্ছে না। হচ্ছে অবশ্যই, শিক্ষা ও চেতনার বিস্তার একটু একটু করে বরফকে গলাচ্ছে বটে কিন্তু সে পরিবর্তন বড়ই মন্থর। সঠিক এবং বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় কুসংস্কারের ক্ষয় ও অপসারণের কাজটি দ্রুততর হলে ভালো হত।''...

সৌমিত্র শ্রীমানীর তিন পর্বে লেখা **'নিরস্ত্রীকরণের এক দশক: প্রতিশ্রুতি ও পরিণতি'**— এই সংখ্যাতে শেষ হয়। অমিত চক্রবর্তী তাঁর রচনায় **'শীতপাখিদের দেশান্তর যাত্রা'**-র কারণ অনুসন্ধান করেছেন, রয়েছে গ্রন্থ পর্যালোচনা—**'বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা মেলে না'**—লেখক অবনীভূষণ ঘোষ। সাপ নিয়ে কিংবদন্তি সিরিজে **'উড়ন্ত সাপ'**-এর রহস্য এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুরের লেখা **'হাতির বেল খাওয়া'** এই সংখ্যার উল্লেখযোগ্য সংযোজন। প্রশ্নোত্তর বিভাগে **'পেঁয়াজ কাটলে চোখে জল আসে কেন?'** এবং **'ডুমুর ফুল চোখে দেখা যায় না অথচ ডুমুরের ফল হয়'**—সত্যিই কি তাই? এসব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পাওয়া যাবে সংখ্যাটিতে।

দ্বিতীয় বর্ষ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১-র আহরণে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকার **'সাঁইবাবা, অলৌকিকতা ও ম্যাজিক প্রসঙ্গে পি সি সরকার (জুনিয়ার)'** সেই সময়ে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। 'গুরুবাদের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ নিছক হাত সাফাই বা ম্যাজিক ছাড়া আর কিছুই নয়'—এই সত্য প্রকাশ করেছিলেন ইন্দ্রজাল শিল্পী পি সি সরকার। 'সমাজ-বিপ্লবের জন্যে বিজ্ঞান' এই মন্ত্রকে পাথেয় করে 'কেরালা শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদ' এক বৃহৎ আন্দোলন সংগঠিত করেছিল, তারই কিছু নমুনা পাওয়া যাবে প্রদীপ দত্ত কর্তৃক সংকলিত **'গণবিজ্ঞান আন্দোলন কেরালায়'** রচনাটিতে। একটি পরিচিত বুজরুকি—**'নাভিশঙ্খের জীবন্ত তাবিজ'**-এর রহস্য উন্মোচন করেছেন লেখক চিত্ত সামন্ত। চীন দেশের চিরস্মরণীয় বস্তুবাদী দার্শনিক 'নব্যচিন্তার বিদ্রোহী নায়ক ওয়ানং চং'-এর কুসংস্কার বিরোধী অন্দোলন কনফুশিনাদের শক্ত ভিতকে নাড়িয়ে দিয়েছিল, যা এই সংখ্যায় পাওয়া যাবে। অন্যান্য নিয়মিত লেখা ছাড়া প্রশ্নোত্তর বিভাবে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক একটি প্রশ্নের —**'পটাশিয়াম সায়ানাইড জিভে দেওয়া মাত্রই মৃত্যু হয় কেন?...'** বিশদে উত্তর জানা যাবে এই সংখ্যাতে।

দ্বিতীয় বর্ষ মার্চ ১৯৮১ সংখ্যাটি শুরু হচ্ছে রাজশেখর বসুর একটি রচনা দিয়ে। রচনাংশটি তাঁর 'লঘুগুরু' গ্রন্থের 'অপবিজ্ঞান' প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে, যা পরশুরাম গ্রন্থাবলীতে অন্তর্ভুক্ত। প্রায় ৪২ বছর আগে আশীষ লাহিড়ীর

লেখা '**কুসংস্কার, বিজ্ঞান, ভাববাদ**' এখনও গভীরভাবে অনুধাবনযোগ্য। প্রবন্ধের শুরুতেই প্রশ্ন 'মানুষ কি বুদ্ধিচালিত প্রাণী? পুরোনো প্রশ্ন। প্রশ্ন উঠতেই পারে। একটা সোজা উত্তর, দুবুর্দ্ধিমানেরা সংখ্যায় বেশি, আসর জাঁকিয়ে রেখেছে তারাই। তুলনায় বুদ্ধিমানেরা নগণ্য।' প্রয়াগের ত্রিবেণী সঙ্গমে সরস্বতী নদীকে অন্তঃসলিলা বলা হয় কেন? তার সঠিক উত্তর পাওয়া যাবে প্রবীর গুপ্তর '**প্রয়াগের রহস্যময়ী সরস্বতী**' গবেষণামূলক রচনাটিতে। '**বিষাক্ত সাপের দংশন কৌশল**'—লিখেছেন অমিয়কুমার হাটি, এছাড়াও '**পুরুষ গাছ ও স্ত্রী গাছ**' এবং '**বৃক্ষ তোমার বয়স কত**'—লেখাগুলি সেই সময় পাঠকের যথেষ্ট দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। উ মা

প্রয়াত সন্দীপ দত্ত (১৯৫১-২০২৩)

কলেজ স্ট্রিট বইপাড়ার গা-ঘেঁষে টেমার লেন বলতেই কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র। যাঁর একক প্রচেষ্টায় এই লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্রটি গড়ে উঠেছিল সেই সন্দীপ দত্ত সম্প্রতি প্রয়াত হলেন। দুষ্প্রাপ্য লিটল ম্যাগাজিন খুঁজতে সন্দীপবাবুর কাছে গেলেই হল। চারদিকে লিটল ম্যাগাজিন—মাঝখানে তিনি। কোন্ সেল্‌ফে কি আছে নিমেষে বলে দিতেন। লিটল ম্যাগাজিন ছিল ওঁর জগৎ। নিজের পয়সা খরচ করে আগাগোড়া লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্রটি চালিয়ে সন্দীপ দত্ত যে মূল্যবান কাজটি করে গেলেন তার তুলনা মেলা ভার। তাঁর প্রয়াণে সংস্কৃতি জগতের যে বড় ক্ষতি হয়ে গেল তা অপূরণীয়। প্রয়াত সন্দীপ দত্তকে জানাই আমাদের গভীর শ্রদ্ধা।

প্রয়াত সৌমেন মুখার্জীকে নিয়ে একটি প্রাণবন্ত আড্ডা

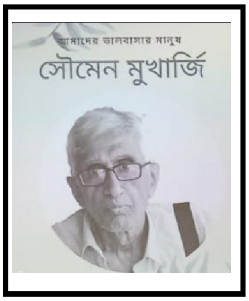

কোনও স্মরণসভায় বক্তারা মন খুলে কথা বলেন না। কেমন যেন একটা আড়ষ্ট ভাব, সতর্ক উচ্চারণ, পাছে কিছু বেফাঁস মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। ১মে ২০২৩-এ কলকাতার জে বি এন এস টি এস অডিটোরিয়ামে প্রয়াত সৌমেন মুখার্জীর স্মৃতিসভাতে যেন তাঁকে নিয়ে এক আড্ডার আসর বসেছিল। তাতে একবারও মনে হল না যে প্রয়াতকে অসম্মান করা হচ্ছে। প্রয়াতের আত্মার শান্তি কামনা, তিনি চির ঘুমে শান্তি পান, যেখানেই থাকুন ভাল থাকুন এসব বাধা গতের কথা শোনা গেল না। স্কাই ওয়াচার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর সদস্যরা যাদের তিনি আকাশ দেখতে শিখিয়েছিলেন সেই সৌমেনস্যার/ সৌমেনবাবু/সৌমেনদা-র সঙ্গে আকাশ দেখতে গিয়ে যেসব মজার মজার অভিজ্ঞতা হয়েছিল স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেসব বলে গেলেন। গোড়াতেই সংস্থার সভাপতি বাসুদেব ভট্টাচার্য-র স্মৃতিচারণ শুনে বেশ বোঝা গেছিল যে এই স্মরণসভা আর পাঁচটা থেকে একেবারে আলাদা রকম হতে চলেছে। সৌমেনবাবুর দীর্ঘদিনের সহযাত্রী রাণা খান স্বভাব রসিক সৌমেন মুখার্জী-র সঙ্গে আকাশ দেখতে গিয়ে যেসব অভিজ্ঞতা হয়েছিল তা সাবলীলভাবে বলে গেলেন। সৌমেনবাবু কীভাবে আকাশ দেখার নেশা ধরিয়ে দিতেন, দূরবীণ ও টেলিস্কোপ নিজের হাতে তৈরিতে তিনি কতটা পারদর্শী ছিলেন সেসবও বললেন। আরেক সদস্য দীপঙ্কর দে সৌমেন স্যারকে নিয়ে যেসব অভিজ্ঞতা হয়েছে তা সুন্দরভাবে বলে গেলেন। দু-একজন সদস্য সৌমেনবাবুর যে কোনও বিষয়ের গভীরে চলে যাওয়া নিয়ে কিছু কিছু ঘটনার উল্লেখ করলেন। ততক্ষণে হল ভর্তি শ্রোতারা আড্ডার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন। কঠোরভাবে প্রচারবিমুখ সৌমেন মুখার্জি যে এক বহুমুখী প্রতিভাধর মানুষ ছিলেন তা বোঝা গেল। স্কাই ওয়াচার্স অ্যাসোসিয়েশন প্রকাশিত সৌমেন মুখার্জীর লেখা বইগুলি পাঠকের হাতে তুলে দিতে সংস্থার সদস্যরা বদ্ধপরিকর। জ্যোতিষ নিয়ে যে বইটির খসড়া সৌমেনবাবু করে গেছেন সেটিও প্রকাশিত হবে বলে সংস্থার সদস্যরা জানালেন। উ মা

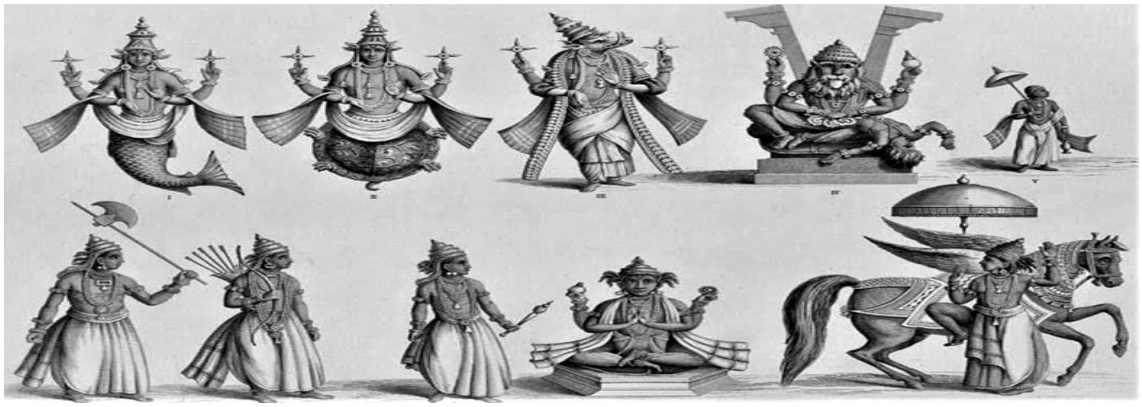

হিন্দু অবতারবাদ

জোতীরাও ফুলে

অনুবাদ : আশীষ লাহিড়ী

পূর্বপ্রকাশিতর পর থেকে

বলি ও বামন রাজার যুদ্ধ

এর পরের পনেরোটা দিন বলিরাজা এতই ব্যস্ত হয়ে রইল যে সব কিছুই তার মাথা থেকে বেরিয়ে গেল। আশ্বিনের শুক্লপক্ষের প্রথমা থেকে অষ্টমী তিথি অব্দি সে এমনকী নিজের প্রাসাদেও বিশ্রাম নেওয়ার জন্য ফিরল না। এদিকে রানি বিন্ধ্যবতী খোজা আর আরাধী নামের চাকর আর ঝিদের দিয়ে এটা মস্ত গর্ত খুঁড়িয়ে নিয়ে তার মধ্যে খানিকটা জ্বালানি কাঠ ছুঁড়ে দিয়ে কাছেই জলভরা একটা হাঁড়ি রেখে টানা আট দিন আট রাত সেই হাঁড়ির ওপর নজর রাখতে লাগল। নির্জলা উপবাস করে প্রভু হরহর মহাদেবের কাছে এক নাগাড়ে প্রার্থনা করে চলল যাতে বামন-রূপী বিপর্যয়ের হাত থেকে প্রভু বলিকে রক্ষা করেন। কিন্তু আট দিনের মাথায় যখন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বলির মৃত্যু সংবাদ এল, রানি গর্তর মধ্যে রাখা কাঠে আগুন ধরিয়ে সেই জ্বলন্ত চিতার মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যু বরণ করল। ঝি-চাকররা, মানে খোজা আর আরাধীরা, হাত কচলে, বুক চাপড়ে, চিৎকার করে রোদন করতে লাগল। নিজেদের জামাকাপড় ছিঁড়ে ছিঁড়ে তারা সেই চিতার মধ্যে নিক্ষেপ করতে লাগল। 'হে দয়াবতী রানি, আপনার সতীত্বর খ্যাতি বিশ্বের দিক দিগন্তে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলছে।' লোকের মন এই ভয়ংকর ঘটনা থেকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য হৃদয়হীন বিপ্র লেখকরা ওই গহ্বরটাকে একটা পবিত্র অগ্নিকুণ্ড রূপে দেখাতে চেয়েছে, যার নাম হোম। এইরকম আরও কিছু পরিবর্তন তারা করেছে।

বলিরাজার মৃত্যুর পর বাণাসুর একটা দিন খুব সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করল, কিন্তু তারপর দিন, মানে আশ্বিনের শুক্লপক্ষের নয় তারিখে, মরীয়া হয়ে পালাতে বাধ্য হল। পিছু পিছু তার সৈন্যসামন্ত ও যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে এল। এই সাফল্য এমনভাবে বামনের মাথায় চড়ে বসল যে সোজাসুজি বলির রাজধানীর ওপর চড়াও হল। রাজধানীকে রক্ষা করবার মতো কোনো পুরুষই নেই দেখে সে আশ্বিনের দশ তারিখ সকালে শহরের সমস্ত অঙ্গনগুলোয় (মহল্লায়) লুটপাট চালাল। মারাঠি ভাষায় 'শিলাঙ্গন-স্বর্ণ' নামে যে-কথাটা আছে সেটা আসলে এই অঙ্গন-লুটপাট সংক্রান্ত কথাটারই অপভ্রংশ। এই কাজ সেরেই বামন সোজা বাড়ি ফিরে এল। সেখানে তার বউ বাড়ির চৌকাঠে ময়দার তৈরি বলিরাজার একখানা মূর্তি রেখে দিয়েছিল। বামন ফেরা মাত্র সে মস্করা করে বলল, 'ওই চেয়ে দেখো, তোমার সঙ্গে লড়বার জন্য বলি আবার হাজির হয়েছে'। শুনে বামন এক লাথি মেরে মূর্তিটাকে ভেঙে দিয়ে তারপর বাড়ি ঢুকল। সেই থেকে দশেরা[১] উৎসবের দিন ব্রাহ্মণ পরিবারগুলোতে এই রেওয়াজ চালু। বাড়ির মেয়েরা ময়দা কিংবা চালের গুঁড়ো দিয়ে বলিরাজার একটা মূর্তির বাঁদিকে রাখে, তারপর আপ্ত একটা ডাল দিয়ে মূর্তিটার পেটে খোঁচা মেরে মূর্তিটাকে মাড়িয়ে গৃহে প্রবেশ করে। দশই আশ্বিন রাতে বাণাসুরের লোকেরা যখন যার যার বাড়ি ফিরল, তাদের ঘরের মেয়েরাও বলির মূর্তি গড়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে বলিরাজা

ফিরে এসে পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবে। থালায় সাজানো জ্বলন্ত প্রদীপ হাতে তারা চৌকাঠে দাঁড়িয়েছিল।

পুরুষদের স্বাগত জানাবার জন্য রেওয়াজ মাফিক তারা সেই থালাগুলো পুরুষদের মুখের চারপাশে ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, 'দ্বিজদের যেসব অধিকার বিপর্যয় হয়ে নেমে আসবে সেগুলো দূর হোক। বলিরাজার রাজত্ব দ্রুত নেমে আসুক'। সেইদিন থেকে ক্ষত্রিয় পরিবারগুলোতে দশই আশ্বিন, তার মানে দশেরার দিন, এই আচারটা পালিত হয়ে আসছে। বাড়ির মেয়েরা তাদের স্বামীদের মুখের চারপাশে প্রদীপ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এই আচার পালন করে, প্রার্থনা করে যাতে বলিরাজত্ব আবার প্রতিষ্ঠিত হয়। একবার ভেবে দেখো, আসন্ন বলিরাজত্ব কতই না মহৎ হবে! কত বড়ো একজন রাজা! কী না করেছে ওরা! কী অসাধারণ ওদের আনুগত্য! ওদের সঙ্গে আজকের হিন্দুদের তুলনা করে দেখো! আজকে তারা ব্রিটিশদের কাঠ থেকে সুযোগসুবিধা পাবার আশায় মহারানির জন্মদিনে প্রকাশ্যে তাঁর নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছে, আর কালকেই খবরের কাগজে কিংবা নিজেদের মধ্যে ঠিক তার উলটো আচরণ করছে!

ধোন্দিবাঃ বেশ, ভালো কথা। কিন্তু বলুন বলিরাজা তার যেসব অমাত্যদের ডেকে পাঠিয়েছিল তাদের কী হল? তারা কি আদপেই এসে তার সঙ্গে হাত মেলাল না?

জোতীরাওঃ না, তারা এসেছিল ঠিকই, তবে দেরিতে। তারা যার যার সৈন্যসামন্ত নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে বাণাসুরের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল আশ্বিনের শুক্লপক্ষের দশম দিনে। তাই না শুনে বলিরাজ্যের সব বিপ্র পিঠটান দিয়ে বামনের কাছে চলে গেল। খবর শুনে বাণাসুর এত ভয় পেয়ে গেল যে সব কজন বিপ্রকে এক জায়গায় এনে বাণাসুরের হাত থেকে তাদের বাঁচাবার একটা রাস্তা বার করার উদ্দেশ্যে তার গৃহদেবতার সামনে সারা রাত ধরে নজরদারি বজায় রাখল, মুক্তির কোনো উপায় দেখানোর জন্য প্রার্থনা করতে লাগল। তারপর সে তার স্ত্রী-সন্তান আর সৈন্যসামন্ত সঙ্গে নিয়ে রাজ্যের সীমান্তে গিয়ে বাণাসুরের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

ধোন্দিবাঃ তখন বাণাসুর কী করল?

জোতীরাওঃ বাণাসুর প্রচণ্ড আক্রমণ হেনে বামনকে হারিয়ে দিল, তার সমস্ত ধনসম্পদ দখল করে নিল। তারপর তাড়া করে বামন আর তার সৈন্যসামন্তদের ওই অঞ্চল থেকে দূর করে পাঠিয়ে দিল একেবারে হিমালয়ে। পাহাড়তলিটাকে ঘিরে ফেলে ওদের খাবারদাবার আসার পথ বন্ধ করে দিল। ফলে বামনের লোকজন না খেতে পেয়ে মরতে শুরু করল। শেষ পর্যন্ত বামন নিজেও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। এইভাবে তার জীবন শেষ হল। সেই খবর শুনে বাণাসুরের অনুগামীরা উল্লাসে ফেটে পড়ে বলতে লাগল, বিপ্রদের মধ্যে এই বামনটাই ছিল সবচেয়ে বড়ো আপদ, সে মরাতে অবশেষে এবার সব সমস্যা মিটেছে। মনে হয় ওই সময় থেকেই বিপ্রদের নাম হল *উপাধ্য*। উপাধ্য শব্দটা এসেছে *উপাধি* থেকে, যার অর্থ কষ্ট।[২] পরে এই উপাধ্যরা সব মৃতদেহ এক জায়গায় জড়ো করে একটাই সর্বজনীন চিতায় (আজ যেটাকে হোলি বলা হয়) তাদের সৎকার করল। কাজেই চিতায় তুলে সৎকার করার প্রথাটা বিপ্রদের মধ্যে প্রাচীন কাল থেকে চালু আছে। একইভাবে, সমস্ত যোদ্ধাদের মৃতদেহ এক জায়গায় জড়ো করে, ফাল্গুনের কৃষ্ণপক্ষের প্রথম তিথিতে বাণাসুর সমেত সব ক্ষত্রিয় বীরবেশে সেজে মাথার ওপর খাপখোলা তরোয়াল ঘোরাতে ঘোরাতে এইসব যোদ্ধাদের শৌর্যর কথা স্মরণ করে নৃত্য করতে লাগল। বোঝা যাচ্ছে, ক্ষত্রিয়দের মধ্যে মৃতদেহ সমাধিস্থ করার রেওয়াজ প্রাচীন কাল থেকে চালু ছিল। সবশেষে, বাকি কজন উপাধ্যদের রক্ষা করবার জন্য নিজের কিছু লোকজন রেখে দিয়ে বাণাসুর তার সঙ্গী অমাত্যদের নিয়ে নিজের রাজধানীতে ফিরে এল। পালন করা হল অনেক বিজয় মহোৎসব। সময় আর জায়গার অভাবে সেসবের বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন। তাই সংক্ষেপে বলছি শোনো। বাণাসুর নিজের ধনসম্পদের হিসেব নিয়ে আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশ তিথিতে তার পূজা করল। পরের দুদিন, মানে চতুর্দশী আর পঞ্চদশী তিথিতে (যেদিন অমাবস্যা) বাণাসুরের সমস্ত অমাত্য অনুগামীদের এক মস্ত ভোজে আপ্যায়িত করা হল, খুব ধূমধাম করে উৎসব হল। তারপর কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের প্রথম তিথিতে সেই অমাত্যদের মর্যাদার স্তরভেদ অনুসারে নানারকম উপহার দিয়ে তাদের যার যার এলাকায় ফিরে গিয়ে আবার কাজকর্ম শুরু করতে বলা হল। এতে সব বয়সের মেয়েরা এতই খুশি হল যে ভালো ভালো খাবার বানিয়ে ভাইদের প্রাণভরে খাওয়াল। তারপর কার্তিকের শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে পবিত্র প্রদীপ জ্বেলে ভাইদের মুখের চারপাশে ঘোরাতে ঘোরাতে মনে করিয়ে দিল বলিরাজের পুনরাগমনের সেই ভবিষ্যদ্বাণীর কথা। বলল: 'সব অশুভ এখান থেকে দূর হোক, ফিরে আসুক বলিরাজ্য!' সেই থেকে সব ক্ষত্রিয় ঘরের মেয়েরা তাদের ভাইদের মনে করিয়ে

দেয় বলিরাজ্যর পুনরাগমনের ওই ভবিষ্যদ্বাণীর কথা, দীপাবলী উৎসবের সময় ভাউবীজ বা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন ভাইদের আশীর্বাদ করে। কিন্তু বলা বাহুল্য, উপাধ্যদের পরিবারগুলোতে এ ধরনের কোনো রীতি চালু নেই।

ধোন্দিবাঃ আচ্ছা, তার মানে বামনের অবতার সেজে আদিনারায়ণ বলিকে পাতালে নির্বাসন দিল। সে বলির কাছ থেকে কেবল পৃথিবীর সেইটুকু জমি চাইল যা সে তিনবার পা ফেলে ঢেকে দিতে পারবে। বলি তার এই ইচ্ছা পূরণে রাজি হল। তখন বামন ছদ্মবেশ ছেড়ে এমন বিশাল এক মানুষের রূপ ধারণ করল যে মাত্র দুবার পা ফেলেই গোটা পৃথিবী আর আকাশ ঢেকে ফেলে বলিকে শুধাল: 'এবার? তৃতীয়বার পা ফেলব কোথায়?' বলিরাজা অত্যন্ত উদার মনের মানুষ ছিল, সে বলল, 'আমার মাথায় পা রাখুন'। তখন বামন বলির মাথায় পা রেখে তাকে ঠেলে পাতালে নামিয়ে দিল। এইভাবে তার প্রতিজ্ঞা রাখল। উপাধ্যরা *ভাগবত* প্রভৃতি বইতে এই বৃত্তান্তই লিখেছে। কিন্তু আপনার যুক্তি শোনার পর তো এসব কিছুই মিথ্যে মনে হচ্ছে। এ নিয়ে কিছু বলবেন?

জোতীরাওঃ এ সমস্যার সমাধানে নিজের বুদ্ধি খাটাও। ভাবো— ওই দানবটা যদি দুই পা ফেলে গোটা পৃথিবী আর আকাশকে ভরে দিয়ে থাকে, তাহলে কতগুলো গ্রাম না জানি তার পায়ের তলায় পিষে গিয়েছিল! যদি সত্যিই সে দ্বিতীয়বার পা ফেলে থাকে আকাশে, তাহলে আকাশটা কী ভয়ানক ঘিঞ্জি হয়ে উঠেছিল ভাবো, আর না জানি কতগুলো নক্ষত্র একে অপরের ওপর দুদ্দাড় ধাক্কা খেয়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তৃতীয় কথা, দানবটা যদি স্রেফ দু পা ফেলেই পৃথিবী আর আকাশ ঢেকে ফেলে থাকে, তাহলে তার ধড়টার কী হল? একজন মানুষ তার নিজের নাভি অব্দি পায়ের পাতা তুলতে পারে। তার মানে আকাশে কোমর থেকে মাথা অব্দি জায়গাটা তো ফাঁকাই ছিল। ও তো ইচ্ছে করলেই সেই ফাঁকা জায়গায় তৃতীয়বার পদক্ষেপ করতে পারত, কিংবা নিজের মাথায় পা রেখে নিজের চুক্তির শর্ত পূর্ণ করতে পারত। অথচ তা না করে ও পা রাখল বলির মাথায়, তাকে ঠেলে নামিয়ে দিল পাতালে। এটা কি জোচ্চুরি নয়? কী বলো তুমি?

ধোন্দিবাঃ অথচ এই দানবটাই কিনা নিজেকে আদি ঈশ্বরের অবতার বলে জাহির করত! আরে, তাই যদি হয়, তাহলে বলির সঙ্গে এরকম একটা ডাহা জোচ্চুরি ও কী করতে পারল? ধিক সেইসব ধাপ্পাবাজ ইতিহাসবিদদের যারা এরকম একটা যাচ্ছেতাই লোককে সাক্ষাৎ ঈশ্বরের অবতার বলে চালিয়ে দিয়েছে। তাদের নিজেদের লেখা থেকেই তো দেখা যাচ্ছে, এই বামন লোকটা ছিল একটা পাক্কা কূটকচালে, জোচ্চোর, বদমাইশ, যে কিনা নিজের উপকারীর সঙ্গে ফেরেব্বাজি করে তাকে পাতালে ঠেলে দিয়েছিল।

জোতীরাওঃ চার নম্বর কথা, দানবটার মাথা যখন গিয়ে ঠেকল আকাশে, অনেক দূর ছাড়িয়ে গেল মহাকাশকেও, তখন তৃতীয় পদক্ষেপ কোথায় করবে সেটা জানবার জন্য তাকে নিশ্চয়ই প্রচণ্ড জোরে চেঁচাতে হয়েছিল, কারণ তামাম দুনিয়া আর আকাশ তো সে দুই পদক্ষেপেই ঢেকে ফেলেছিল। পৃথিবীতে বলি আর আকাশে দানবের মাথা, এ দুয়ের মধ্যে কত মাইলের দূরত্ব তার ইয়ত্তা নেই। তাহলে রুশ, ফরাসি, ব্রিটিশ আর আমেরিকানরা তার বক্তব্যর একটা শব্দও শুনতে পেল না কেন? একই ভাবে, পৃথিবী থেকে বলি যদি সত্যিই বামনকে তার তিন নম্বর পদক্ষেপটি নিজের মাথায় করার কথা বলে থাকে, তাহলে বামনের কানে সেকথা পৌঁছল কী করে? বলি নিশ্চয়ই বামনেরই মতো দানবাকৃতি ধারণ করেনি? আর পাঁচ নম্বর কথাটা এই যে, বামনের ভারে পৃথিবীটা ধসে পড়ল না কেন?

ধোন্দিবাঃ আজকের দিনে এ ছাড়া আর অন্য কীভাবে আমরা ব্যাপারটা দেখতে পারি? আমার তো জানতে ইচ্ছে করে, দানবটা কী খেয়ে বাঁচত? আর মরবার পর তার ওই বিশাল লাশটাকে কাঁধে করে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার মতো চারজন বাহকই বা কোথা থেকে পাওয়া গেল? যদি ধরে নিই, ও যেখানে মরেছিল সেখানেই পোড়ানো হয়েছিল, তাহলে প্রশ্ন, অত বড়ো লাশটা পোড়াবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ ঘুঁটে কিংবা কাঠ কোত্থেকে পাওয়া গেল? যদি ধরে নিই, মড়াটা পোড়ানো হয়নি, তাহলে লাশটার কী হল? শেয়াল-কুকুরে নিশ্চয়ই সেটা অনেক দিন ধরে খেয়েছিল? সোজা কথাটা হল, এই সমস্ত সংশয়ের উত্তর যদি *ভাগবত* বা ওই ধরনের বইপত্র থেকে না-ই মেলে, তাহলে মানতে হবে, উপাধ্যরা লোকমুখে চালু গল্পগাথার ভিত্তিতেই তাদের এই তথাকথিত ঐতিহাসিক রচনাগুলো লিখেছিল।

জোতীরাওঃ বুঝলে ভাই, একটি বার *ভাগবত* পড়ার চেষ্টা করো। আমি নিশ্চিত যে ইশপের কাহিনীগুলো তোমার বেশি উপাদেয় মনে হবে! **(চলবে)**

১। বিজয়া দশমী

২। এটাও শব্দের ব্যুৎপত্তি নিয়ে ফুলের নিজস্ব কেরামতির এক উদাহরণ। আসলে সংস্কৃত উপাধ্য শব্দটা এসেছে উপাধ্যায় থেকে, যার অর্থ পুরোহিত, যিনি আচার-অনুষ্ঠান (ধর্মীয়) আর উৎসবের মুখ্য পরিচালক। এর সঙ্গে উপাধি শব্দের সম্পর্ক স্থাপন করে ফুলে আসলে পৌরোহিত্য নামক প্রতিষ্ঠানকে আক্রমণ করেছেন। শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখানো তাঁর আসল উদ্দেশ্য নয়। উমা

করে দেখো ভালো লাগবে (২)

শুভেন্দু দাশগুপ্ত

আমাদের ইস্কুলবেলায় আমরা কয়েকটা কাজ করতাম। তোমরাও তোমাদের এখন এই স্কুলবেলায় সেই কয়েকটা কাজ করতেই পারো। কঠিন কিছু নয়।

আমি বলছি। দেখো।

আমরা যখন ইস্কুলের কোনো একটা ক্লাসের পড়ার বই পড়তাম, কখনও বইতে আমাদের নাম লিখতাম না। বইতে কোনো দাগ দিতাম না। কেন জানো?

আমরা যখন একটা ক্লাস থেকে উপরের ক্লাসে উঠতাম যেমন ধরো সপ্তম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী, আমাদের বইগুলো যাতে অন্যরা যারা এই ক্লাসে, সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হবে তারাও পড়তে পারে।

পরিবারের তো সব বই কেনার মতো টাকা পয়সা নাও থাকতে পারে। আমরা উপরের ক্লাসে অষ্টম শ্রেণীতে ওঠার সময় বইগুলো স্কুলে জমা দিয়ে দিতাম। যারা এবার সপ্তম শ্রেণীতে আসবে তাদেরকে দরকার মতো ইস্কুল দিয়ে দিত।

২

অনেক সময় আমাদের সবার সব ইস্কুল রাজি হতো না। আমরা তখন সেই ইস্কুলের গেটের বাইরে কাগজে হাতে লিখে আঠা লাগিয়ে সেঁটে দিতাম। কাজ হতো। করতে চাইলে ঠিক উপায় বের করে নেওয়া যায়। বাধা পেলে উপায় বের হবেই।

তোমরা শুরু করে দেখো, মা বাবা দিদি দাদাদের বলো, বন্ধুদের বলো, দেখবে পারবে। আমরা পারলে তোমরা পারবে না কেন?

আমরা এরকমই আর একটা কাণ্ড করতাম। সেটা গল্পের বই, এমনি পড়ার বই নিয়ে। সবার তো এসব বই কেনার মতো সুযোগ থাকে না। যাদের সুযোগ ছিল তারা অন্যদের সাথে ভাগ করে নিয়ে পড়তাম। এসব বই একা একা পড়ে মজা নেই। পড়েই অন্যদেরকে বলতে ইচ্ছে করতো। অন্যদেরকে পড়ালেই তবে ভালো লাগতো। অন্যরা পড়লে তবেই বইটা নিয়ে একথা সেকথা বলা যেত। কোনো একটা বই পড়লেই দেখবে ইচ্ছে করবে বইটা নিয়ে কাউকে বলি। বলি এই জায়গাটা কী দারুণ! এই জায়গা ঠিক ধরতে পারছি না, একজন বন্ধুকে পড়িয়ে বুঝে নিই। এমনই সব মনে হওয়া।

৩

তুমি একটা বই পেলে, একটা বই কিনলে, অন্য একজন আর একটা বই পেলো, একটা বই কিনলো, তোমার পড়া হয়ে গেলে তোমাকে দিল। তোমরা আবার আর একজনকে দিলে তার কাছ থেকে কোনো বই না পেলেও। এভাবে তোমার বই পড়া বাড়বে, তোমার বই-পড়া বন্ধুরা বাড়বে।

তারপর একদিন এক বন্ধুর বাড়িতে বসে কয়েকজন মিলে জড়ো হয়ে বইটা নিয়ে কথা বললে, শুনলে, মত দিলে। এভাবে তোমাদের ভাবনা বাড়বে, ভাবনা ছড়াবে।

আমরা, আমাদের ইস্কুলবেলায় এভাবে বই কিনে, বই পেয়ে, বই পড়িয়ে আস্তে আস্তে এক বন্ধুর বাড়িতে একটা ঘরে একটা খালি তাক যোগাড় করে বই রেখে রেখে একটা লাইব্রেরি বানিয়ে ফেলেছিলাম। তোমরাও পারো।

একটা কথা বলি, তা মনে রেখো, পরীক্ষা করে দেখতে পারো, বাংলা ভাষায় যা কিশোর সাহিত্য আছে তা খুব খুবই ভালো। পড়ে শেষ করতে পারবে না।

৪

জানো তো একবার বই পড়ার নেশা হয়ে গেলে কী যে আনন্দ তা ভাবতেই পারবে না। অন্য বই পড়লে ইস্কুলের বই পড়ার কোনো ক্ষতি হয় না। বরং বই পড়ার অভ্যেস বাড়বে।

পড়তে পড়তে, জানতে জানতে, ভাবতে ভাবতে, বন্ধুদের কাছ থেকে শুনতে শুনতে দেখবে একদিন তোমারই, তোমাদেরই লিখতে ইচ্ছে করবে। আর কোথায় কোথায় তোমাদের লেখা রাখবে, কি ভাবে অন্যদের পড়াবে তার কথা তো তোমাদের জন্য আমার আগের লেখাতেই বলেছি। আবার পড়ে দেখো আগের লেখাটা!

এই যে নিজে পড়া, অন্যকে পড়ানো, অন্যকে পড়িয়ে নিজের বুঝতে পারা এই কাজটা আমরা আরেকভাবে করতাম।

আমরা যে পাড়ায় থাকতাম, সে পাড়ায় কেউ কেউ নিজেরা পড়তো, কেউ দিদি দাদাদের কাছে পড়তো, কেউ কেউ বন্ধুদের কাছে পড়া বুঝে নিতো। অনেকসময় এমন হয়েছে আমার

ক্লাসের নিচের ক্লাসে যে পড়ে সে বা তার বাড়ির লোকেরা বলেছে তাকে একটা দেখিয়ে দিতে, পড়া বুঝিয়ে দিতে।

৫

এমনটি আরও কয়েকজনের মতো আমাকেও করতে হয়েছে। দেখেছি পড়া দেখিয়ে দিতে গিয়ে, পড়ার বিষয়টা বুঝিয়ে দিতে গিয়ে তার যতটা না কাজে লেগেছি, অনেক বেশি কাজ হয়েছে আমার। আমার নিজের বুঝতে পারাটা অনেক পরিষ্কার হয়েছে, অনেক বেড়েছে।

তখন আমাদের পাড়ায় কয়েকজন মিলে একটা সন্ধ্যেবেলার ক্লাস শুরু করেছিল। যাদের অন্যদের কাছে পড়ার মতো টাকা পয়সা নেই তাদের জন্য। ডাক পড়তো আমাদের মতো স্কুল পড়ুয়াদের, যাদের অন্যদেরকে পড়াতে যেতে আপত্তি নেই, না আমার আপত্তি, না আমার বাড়ির আপত্তি।

এইভাবে স্কুলে পড়তে পড়তেই অনেককে একসাথে পড়া বুঝিয়ে দিতে গিয়ে খুব আনন্দ পেয়েছি। আনন্দ পেয়েছি এই ভেবে যে কতজনের কাজে লাগছি। তার চেয়ে বড়ো কথা এই পড়ানোটা আমার নিজেরই খুব কাজে লেগেছে। পরে যখন কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গেছি, গবেষণা করেছি, শিক্ষক হয়েছি, লিখেছি, বলেছি তখন টের পেয়েছি আমার ছাত্র থাকার সময়কার এই সব কাজের উপকার।

এই লেখাটায় যা যা বলা হল, শুরু করে দাও বন্ধুদের সাথে কথা বলে, লোকেদের সাথে কথা বলে।

দরকার পড়লে আমাদের ডেকো। আমরাও চলে যাব তোমাদের পাশে।

উমা

মাতৃভাষা শিক্ষায় বাংলা প্রাইমার

সৌরভ দাস

একটি মানুষের পূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্রে কয়েকটি দিক আছে—দেহ, জ্ঞান, কর্ম ও অনুভূতি। ব্যক্তির এই বিকাশধারাকে অনুসরণ করে বলা যায় জ্ঞানার্জন, চিন্তন ও মননের অন্যতম হাতিয়ার হল তার মাতৃভাষা, যা শৈশব থেকেই তার অনুভূতির সুষম বিকাশ, সুরুচি ও সৌন্দর্যবোধ গঠন তথা সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ সাধনে সহায়ক হয়। তাই সহজ সরল উপায়ে শিশুর মাতৃভাষায় অনুশীলন প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে সাধারণভাবে মাতৃভাষা শিক্ষার ত্রিবিধ উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে—ক) মাতৃভাষায় শব্দভাণ্ডার বাড়ানো এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে ভাবগ্রহণ ও ভাবপ্রকাশের উন্নতি সাধন, খ) মাতৃভাষায় মৌখিক ও লিখিতভাবে মনের ভাব প্রকাশ করার এবং লিখিত বক্তব্য পড়ে ও অন্যের বক্তব্য শুনে বোঝার দক্ষতা অর্জন এবং গ) রুচিসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও যুক্তিশীল মানসিকতা গঠন। এই তিনটি উদ্দেশ্য সফল করতে অন্যান্য ভাষার পাশাপাশি বাংলা ভাষাতেও বহু সংখ্যক প্রাথমিক শিক্ষাগ্রন্থ লেখা হয়েছে; যার ফলে বাঙালি শিশু কালে-কালান্তরে তার মাতৃভাষা শিক্ষার পাঠ গ্রহণ করেছে, করছে এবং করবে।

আজকের বাঙালি শিশু পড়ুয়ারা ঠিক কী বই পড়ে তাদের মাতৃভাষার প্রথম পাঠ নিচ্ছে? এই জিজ্ঞাসা থেকেই লেখকের ক্ষুদ্র অনুসন্ধান। যে অনুসন্ধান স্বভাবতই হাতছানি দেয় লেখকের শৈশবস্মৃতিকেও। যেহেতু বর্তমানে আলোচ্য বিষয় বাঙালি শিশুর মাতৃভাষা শিক্ষার প্রাথমিক শিক্ষাগ্রন্থ বা 'প্রাইমার', সেহেতু শিশুর ভাষা শিক্ষার পর্যায়গুলি তথা তার মাতৃভাষা শিক্ষার গুরুত্ব এবং তা শেখার প্রাথমিক শিক্ষাগ্রন্থ বা 'প্রাইমার' বলতে ঠিক কী বুঝি তা সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

প্রথমেই জানব শিশুর ভাষা শিক্ষার ক্ষমতা এবং ভাষা শিক্ষার পর্যায়গুলিকে। মানবশিশুর ভাষা শিক্ষার অনায়াস দক্ষতা ব্যাপারটা খুবই বিস্ময়কর। ভাষা বিষয়টা খুব সহজ কোনো বস্তু নয়। তা সত্ত্বেও কীভাবে, কেবলমাত্র মানুষের পক্ষে এ কাজটা করা সম্ভব হয়? এর উত্তর নানা সময়ের ভাষাবিজ্ঞানীরা নানানভাবে দিয়েছেন। যেমন ব্যবহারবাদীরা বা বিহেভিয়ারিস্টরা বিশ্বাস করতেন যে, শিশু তার পিতা-মাতার কাছ থেকে যে ভাষা শোনে সেটাই নকল করতে ভাষা শিখে ফেলে। কিন্তু প্রখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী নোয়াম চমস্কি—বি এফ স্কিনারের 'Verbal Behavior' বই-এর সমালোচনায় (১৯৫৭) এই মতের হাস্যকর দিকটি প্রমাণ করেছেন। তিনি বলেছেন, শিশু যদি যা শোনে তারই অনুকরণ এবং অনুশীলন করেই ভাষা শিখবে, তাহলে সে কীভাবে লক্ষ লক্ষ নতুন বাক্য বলে কিংবা শুনে বুঝতে পারে, যেগুলি সে ছোটবেলায় শোনেনি? প্রসিদ্ধ ভাষাবিজ্ঞানী ড. পবিত্র সরকার মনে করেন, মানবশিশুর ভাষা শিক্ষার বিষয়ে ভাষাবিজ্ঞানী নোয়াম চমস্কি তাঁর 'Aspects of the Theory of Syntax' (১৯৬৫) গ্রন্থে যে কথাগুলো বলেছেন, তা এই সময়ে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য উত্তর— ''আর কোনো পশু বা পাখি বা প্রাণী নয়, কেবল মানুষের

শিশুই ভাষা শেখার জন্মগত ক্ষমতার অধিকারী। সে ভাষা শিক্ষার জন্য Pre-programmed কোন দিক থেকে? না সে এ বিষয়ে Geentically Programmed। এটাকেই চমস্কি অন্যভাবে বলেন যে, একটা Innate human faculte de language রয়েছে। অর্থাৎ তার মানবত্বই তার মধ্যে এই ক্ষমতা ভরে দিয়েছে। এ ক্ষমতা এক অলৌকিক ঈশ্বরের দান—আগেকার মানুষ বিশ্বাস করত, কিন্তু বিজ্ঞানে এমন কথার কোন মূল্য নেই।"

অতএব, মানবশিশু জৈবিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে তার ভাষাশিক্ষার ক্ষমতাকে আয়ত্ত করে। কিন্তু জন্মের পরেই তো কোনো শিশু স্পষ্টভাবে ভাষা ব্যবহার করতে পারে না, তাকে বেশ কয়েকটি পর্যায় অতিক্রম করে, পরিণত ভাষা-দক্ষতা অর্জন করতে হয় (ফক্স পি টু জিনের কল্যাণে)। এ প্রসঙ্গে Jean Aitchison তাঁর The Articulate Mammal (১৯৮৯) গ্রন্থে শিশুর প্রথম শিক্ষার পর্যায়গুলির পাশাপাশি তাদের আনুমানিক কালপর্বসীমাকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে দিয়েছেন। ড. সরকারের 'ভাষা দেশ কাল' বইটি থেকে উক্ত সারণির বঙ্গীয় রূপটি তুলে ধরার চেষ্টা করা হল—

ভাষা পর্যায়	শুরু হওয়ার বয়স
কান্না	জন্মকাল
কু-কু (cooing)	ছয় সপ্তাহ
কলধ্বনি (babling)	ছয় মাস
কথার সুর (innotation patterns)	আট মাস
এক শব্দ পর্ব	এক বছর
দুই শব্দ পর্ব	দেড় বছর
পদনির্মাণ	দু বছর
প্রশ্ন, নিষেধবাক্য	সওয়া দু বছর
জটিল বাক্য	পাঁচ বছর
পরিণত ভাষাদক্ষতা	দশ বছর

উপরিউক্ত পর্যায়ক্রমে শিশু তার ভাষা শিক্ষা সম্পূর্ণ করল। এই ভাষা হল (ভাষ্+আ) চিন্তার প্রতীক। ড. সুকুমার সেনের মতে, ''মানুষের উচ্চারিত, অর্থবহ, বহুজনবোধ্য ধ্বনিসমষ্টির ভাষা।" দেশ-কাল-পাত্র ভেদে মানুষ আপন আপন ভাষায় তাদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনাকে প্রকাশ করে থাকে। এক্ষেত্রে আমরা যে ভাষার দাবীদার, সে ভাষা গঠিত হল কীভাবে সে প্রসঙ্গে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলছেন, ''বাংলাদেশে জাতি ও ধর্ম নির্বিশেষে বাঙালি জনসমাজে ব্যবহৃত শব্দ লইয়া বঙ্গভাষা বা বাঙ্গালা ভাষা গঠিত।" এই বাংলা ভাষাই হল আমাদের মাতৃভাষা। এবং শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষার গুরুত্ব ঠিক কতখানি তা বলাই বাহুল্য। শুধু রবীন্দ্রনাথের একটি ছোট উদ্ধৃতি দিয়ে এ প্রসঙ্গের ইতি টানা যায়— 'শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ...' (শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ)।

শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষার গুরুত্ব থাকায়, তা শেখাবার প্রয়োজন এসেই পড়ে এবং সেক্ষেত্রে সহায়ক হয়, ভাষা শিক্ষার প্রথম পাঠ্য বই বা প্রাইমারের। 'প্রাইমার' কী? সে বিষয়ে অধ্যাপক আশিস খাস্তগীর বলেছেন—'শিশুর পড়ুয়া জীবনের শুরুতে যে বইটি তার হাতে তুলে দেওয়া হয়, সেটি প্রাইমার।... প্রাইমারের মধ্যে দিয়ে শিশু তার ভাষার ধ্বনি আর বর্ণের সম্পর্কটি বুঝতে শেখে। বর্ণযোজন দ্বারা শব্দগঠন ও বাক্যগঠন প্রক্রিয়া আয়ত্ত করে। একই সঙ্গে সঠিক বানানরীতি সম্বন্ধেও তার সম্যক ধারণাটি গড়ে ওঠে। অর্থাৎ প্রাইমার আসলে একটা সিঁড়ি। ধাপে ধাপে শিশুকে চিনতে শেখায় লিখিত ভাষার বিশাল জগতের প্রথম ছবিটিকে।'

'প্রাইমার' শব্দের যথার্থ বাংলা প্রতিশব্দ বাঙালি এখনও খুঁজে পায় নি। তবে 'প্রাইমার' শব্দটির সঙ্গে 'প্রাইমারি' শব্দটির যে গভীর সংযোগ রয়েছে, সেটা অনুমান করাই যায়। অক্সফোর্ড অ্যাডভান্সড লার্নার্স ডিক্সনারিতে 'প্রাইমার'-এর সংজ্ঞায় বলা আছে— 'A book that contains the basic facts of a school subject for people beginning to learn it.'

কাজেই প্রাইমার অর্থে 'প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তক' কথাটির ব্যবহার চলতে পারে। তবে মূলত শিশুশিক্ষার থেকেই প্রাইমারের ধারণা এসেছে বলে 'প্রাইমার' অর্থে 'শিশুশিক্ষার প্রথম বই' কথাটিই যথোপযুক্ত বলে মনে হয়। অর্থাৎ আক্ষরিকভাবে ভাষাশিক্ষা দেওয়া নয়, বরং ভাষাশিক্ষার একটা সহজ রাস্তা শিখিয়ে দেওয়াই প্রাইমারের কাজ। ভারতে পা রাখার কিছুকাল পরেই বিদেশী মিশনারিরা উপলব্ধি করলেন, ধর্মপ্রচার করার জন্য চাই শিক্ষার প্রসার এবং শিক্ষার্থীর মাতৃভাষায় শিক্ষাবিস্তার। ১৮১৬ সালে তারা প্রায় শতাধিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন, যেখানে ছাত্রসংখ্যাও বেড়ে দাঁড়াল ৭০০০-এর বেশি। সে বছরেই ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশনারিরা ১২ পৃষ্ঠার একটা 'প্রাইমার' —বাংলা বর্ণশিক্ষার প্রথম বই বলা যায়। সুতরাং একটা কথা স্পষ্ট, বাংলা ভাষার প্রথম প্রাইমার লেখার গৌরব বাঙালির প্রাপ্য নয়। কিন্তু 'লিপিধারা'র (১৮১৬) বেশ কিছুকাল পরে ১৮৩৫ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বসু লিখলেন 'শব্দসার'। এটিই সম্ভবত দেশীয় মানুষ রচিত বর্ণশিক্ষার প্রথম বই (মতভেদ আছে)। এরপর থেকে বাঙালি একটু একটু করে 'প্রাইমার' রচনার পথে এগিয়ে আসে।

ফলে উনিশ শতকের শেষে এসে শিশুপাঠ্য বর্ণশিক্ষা গ্রন্থের যে তালিকা মেলে, সেখানে দেখি সে যাবৎ ৫০০টিরও বেশি প্রাইমার লেখা হয়েছিল। ১৮১৬ থেকে ২০২৩ প্রায় দু'শো সাত বছর (২০৭) ধরে বাংলা প্রাইমার লেখা হয়েছে এবং কালে কালে তার পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন হয়েছে। যার মূল কারণ শিশুর ভাষাশিক্ষাকে আরও সহজ বা সরল করে তোলা। কারণ মাতৃভাষার শিক্ষা শিশুকে শুধুমাত্র তার বাড়ির ভাষাকে শ্রদ্ধা করতে শেখাবে না, একই সাথে পরবর্তী স্তরে ধ্রুপদী এবং বিদেশি ভাষা শিক্ষারও সহায়ক হয়ে উঠবে। মাতৃভাষা শিক্ষার সুদূরপ্রসারী এই প্রয়োজনীয়তাকে 'জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫'-ও স্বীকার করে নিয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে— ক) ভাষাশিক্ষা কখনোই ভাষার জন্য নির্ধারিত ঘণ্টায় আবদ্ধ থাকে না। বিজ্ঞান-সমাজবিজ্ঞান, অঙ্ক প্রভৃতি বিষয় শিক্ষার নির্ধারিত সময়েও শ্রেণিকক্ষে এক অর্থে ভাষাশিক্ষাই দেওয়া হয়। বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরে সব বিষয় শিক্ষকই ভাষা শিক্ষক। খ) এই সমস্ত বিষয়গুলি শিক্ষার অর্থ হল—এদের নির্দিষ্ট পরিভাষাগুলি জানা, বিষয় সংক্রান্ত ধারণাগুলি অনুধাবন করা এবং যুক্তির মাধ্যমে ওই সব বিষয়ে আলাপ আলোচনা ও লিখতে সক্ষম হওয়া। গ) শিশুকে উৎসাহিত করতে হবে কিছু আনুষঙ্গিক কাজে। যেমন পাঠ্যপুস্তক ও সহায়ক পুস্তকের সাহায্য নেওয়া, অন্যান্য মানুষের সঙ্গে কথা বলা (বিভিন্ন ভাষায়), ইন্টারনেট থেকে নানা উপাদান সংগ্রহ করা ইত্যাদি। ঘ) সমগ্র পাঠক্রমে ভাষার ক্ষেত্রে এইরকম নীতি গ্রহণ করলে বিভিন্ন ভাষাচর্চাকে মর্যাদা দেওয়া যাবে। সেই সঙ্গে ভাষার ঘণ্টাতেও কিছু অনবদ্য সুযোগ থাকতে হবে। ঙ) গল্প, কবিতা, গান, নাটক ইত্যাদি শিশুকে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত করে যা নিজের অভিজ্ঞতা অন্যকে বোঝাতে এবং অন্যের প্রতি সহমর্মিতা গঠনে বিশেষভাবে উপযোগী। চ) এর ফলে একঘেয়েমি দূর হয় এবং শিশুরা একত্রে অনায়াসেই জটিল, কঠিন বিষয়গুলিকে আত্মস্থ করতে পারে। ছ) বিভিন্ন দক্ষতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা নিজেরাই সামাজিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ভাষা দক্ষতা বাড়িয়ে তোলে। তাদের স্বাধীন পন্থাও ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট উপাদান। যা শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশের উন্নতিসাধনে সহায়ক।

উপরিউক্ত কথাগুলির ভিত্তিতে মাতৃভাষা শিক্ষার গুরুত্ব বিষয়ে কোনোরকম সন্দেহ থাকে না। বাঙালি তার মাতৃভাষাকে সহজ থেকে সহজতর উপায়ে শিখে নিতে কালে-কালান্তরে বহু সংখ্যক প্রাইমারের জন্ম দিয়েছে। ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রাইমারের বিবর্তনের রেখাচিত্র অঙ্কন করা সম্ভব হলে দেখা যাবে সেই রেখাচিত্রের মান ক্রমোর্ধমুখী। সবচেয়ে বড় কথা এটাই যে, কালে কালান্তরে বাংলা প্রাইমারের কাঠামো আমূল পরিবর্তিত হয়েছে। বিভিন্ন শিল্পীর হাতে প্রাইমারের আঙ্গিক পাল্টেছে এবং ধীরে ধীরে উৎকর্ষতা লাভ করেছে ও বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছে। প্রাইমারে ব্যবহৃত চিত্রের মধ্যেও বিবর্তনের ইঙ্গিত দৃঢ়ভাবে প্রতীয়মান। তাই প্রাইমার হল এমন একটা সিঁড়ি, যা ধাপে ধাপে শিশুকে চিনতে শেখায় তার লিখিত ভাষার বিশাল জগতের প্রাথমিক ছবিটাকে।

তথ্যসূত্র:

১) খাস্তগীর, আশিস (সম্পা.), *বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ* (১৮১৬-১৮৫৫), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, জানুয়ারি ২০০৬।

২) চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, *ভাষা-প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ*, রূপা অ্যান্ড কোম্পানি, জানু. ২০০৩।

৩) জাতীয় পাঠক্রম রূপরেখা ২০০৫, এন সি ই আর টি, ২০০৫।

৪) সরকার, পবিত্র, *ভাষা দেশ কাল*, মিত্র ও ঘোষ, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৯।

৫) সেন, সুকুমার, *ভাষার ইতিবৃত্ত*, আনন্দ পাবলিশার্স, মে ২০০৭।

উমা

এদেশে অনেকে মনে করেন, ভাস্করাচার্য একাদশ শতাব্দীতে অতি অস্পষ্টভাবে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং তিনি নিউটনের সমতুল্য। কিন্তু এই সমস্ত অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী শ্রেণীর তার্কিকগণ ভুলিয়া যান যে, ভাস্করাচার্য কোথাও পৃথিবী ও অপরাপর গ্রহ সূর্যের চারিদিকে বৃত্তাভাস (elliptical) পথে ভ্রমণ করিতেছে একথা বলেন না। সুতরাং ভাস্করাচার্য বা কোনো হিন্দু, গ্রীক বা আরবী পণ্ডিত কেপলার-গ্যালিলিও বা নিউটনের বহু পূর্বেই মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, এরূপ উক্তি করা পাগলের প্রলাপ বই কিছুই নয়।

(মেঘনাদ রচনা সংকলন, পৃ.১৬১)

সূত্রঃ প্রবন্ধ সংগ্রহ, অম্লান দত্ত (পৃ.১৯২)

বিচ্ছিন্নতা নিয়ে ভাবনাতেও পথিকৃৎ

সমীরকুমার ঘোষ

এদেশে পাভলভীয় মনোবিজ্ঞান চর্চার পথিকৃৎ মনোরোগবিশেষজ্ঞ
ডা. ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবন ও কাজের কথা

পঞ্চম পর্ব

পাভলভ-পথে চিকিৎসা

পাভলভীয় মনোবিজ্ঞানে সেকেন্ড সিগনালিং সিস্টেম বা দ্বিতীয় সঙ্কেত পদ্ধতি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই দ্বিতীয় সঙ্কেত হল শব্দ বা কথা। যা মানুষকে আর পাঁচটা জীবের চেয়ে আলাদা করেছে। এটা একটু ব্যাখ্যা করলে পাঠকের বুঝতে সুবিধে হতে পারে। শারীরবিজ্ঞানের লোক হলেও পাভলভ শেষ জীবনের অধিকাংশ সময় মনোরোগ ও মানবমন নিয়ে গবেষণা চালিয়েছেন। হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগী নিয়ে অনেকদিন কাজ করার পর তিনি দ্বিতীয় সঙ্কেততন্ত্রের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হন। জানান, বিবর্তনের ফলে মানবমস্তিষ্কে একটি নতুন ব্যবস্থার সংযোজন ঘটেছে। তার ফলে পশু ও মানবমস্তিষ্কের মধ্যে ঘটেছে দুস্তর সাংগঠনিক ও কার্মিক, ইংরেজিতে বললে স্ট্রাকচারাল ও ফাংশানাল পার্থক্য। বেঁচে থাকা ও বংশরক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে কোনো উদ্দীপক ইন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করলে প্রাণী সেই উদ্দীপকের সঙ্কেতে সাড়া দিতে অভ্যস্ত। পঞ্চেন্দ্রিয়ভিত্তিক এই সাড়া দেওয়ার ব্যবস্থাকে প্রথম সঙ্কেততন্ত্র বা ফার্স্ট সিগনালিং সিস্টেম বলা হয়। মানুষের সেটা তো আছেই, এর পাশাপাশি ইন্দ্রিয়ভিত্তিক নতুন সঙ্কেত ‘অর্থবাহী শব্দ’-এর সঙ্গেও সাময়িক পরাবর্ত বা রিফ্লেক্স তৈরি করে সে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার বিশেষ ক্ষমতা অর্জন করেছে। এতে তার অভিযোজন ক্ষমতা অনেকগুণ বেড়েছে। একটা উদাহরণ দিই। হরিণের দল চলছে বনপথ দিয়ে। দক্ষিণের বাতাসে বাঘের গন্ধ তার নাকে এল। এই গন্ধের সঙ্গে তাদের পালিয়ে যাওয়ার পরাবর্তক্রিয়া গড়ে উঠেছে। তারা তখুনি দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটল। ছত্রভঙ্গ হয়ে বেশ কয়েকটা হয়ত ওই দক্ষিণ দিকেই ছুটে গিয়ে বাঘের খপ্পরে পড়ল। মানুষ হলে কী করবে। তারা প্রথমে দেখবে কোন দিক থেকে বাতাস গন্ধ বয়ে আনছে। এরপর পরস্পরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিচার করবে কোন জাতের বাঘ, তারা একসঙ্গে চিৎকার করলে বাঘটা ভয় পাবে কি না, আগুন জ্বালিয়ে বাঘটাকে ভয় দেখানো চলে কি না। তারপর সিদ্ধান্ত নেবে ‘স্থানত্যাগেন’ নীতি গ্রহণ করবে না, বাঘের মোকাবিলা করবে। পালাতে হলে যেদিক থেকে গন্ধ আসছে, তার উল্টো দিকেই তারা ছুটবে। দ্বিতীয় সঙ্কেততন্ত্রের গুরুত্ব ও উপযোগিতা এখানেই। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী ধারণাকে পাভলভের পরীক্ষা-নিরীক্ষালব্ধ এই আবিষ্কার সমৃদ্ধ করেছে। যদিও পাভলভ কিন্তু মার্কসবাদ বা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। ঠিকভাবে বললে, তিনি রাজনীতি বা দর্শন নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাতেন না।

ফিরে আসি ধীরেনবাবুর কথায়। মনোরোগীদের চিকিৎসা করার ক্ষেত্রে কোনোদিনই ওঁর কোনো ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি কাজ করে নি। তাই নার্সিংহোম জাতীয় কিছু করেন নি। ঠিক অর্থে বললে, নার্সিংহোমে রেখে চিকিৎসায় বিশ্বাসও করতেন না। বলতেন, বাড়িতে রেখেই সবচেয়ে ভালো চিকিৎসা হয়। বাড়ির লোকে যেভাবে দেখাশোনা করে, নার্সিংহোমের লোকেরা তা করবে কেন! ফ্রান্সের উদাহরণ দিতেন। ওখানে অনেকে বাড়িতে অন্য পরিবারের মানসিক অসুস্থ লোকেদেরও রেখে দেখাশোনা করত। উগ্রমূর্তি ধরা রোগীদের ক্ষেত্রে? বলতেন, এখন ভালো ট্র্যাঙ্কুলাইজার আছে। এক-দু দিনেই রোগীর উত্তেজনা কমানো যায়। বাড়িতে একটু নজরে রাখতে হয় এই যা। প্রসঙ্গত কলকাতায় যে সমস্ত চিকিৎসকের নার্সিংহোম আছে, সেখানকার কথাও বলতেন। তাঁদের কাছ-ফেরত রোগীর বাড়ির লোকজনের মুখে শুনেছেন, রোগীকে যেসব ওষুধ খাওয়ানোর কথা, তা ড্রয়ারেই পড়ে থাকে। নিয়ম মতো খাওয়ানো হত না। এইসব নার্সিংহোমে

বাড়ির লোকেদের ভিতরে গিয়ে রোগীকে দেখতে দেওয়া হয় না। এ প্রসঙ্গে আমার এক অভিজ্ঞতার কথা বলি।

পাশের বাড়ির একজন অসুখ বেড়ে গেলে উগ্র হয়ে উঠত। তাকে কৈখালির এক নামী চিকিৎসক দেখতেন। বাড়াবাড়ি হলে তাঁর নার্সিংহোমে রাখা হত মাস দেড়েক-দুয়েক। সুস্থ হয়ে ফিরত। আবার এক-দেড় বছর পর রোগের আবির্ভাব হত। সুস্থ হয়ে ওঠার পর সে জানায়, তাকে বিছানার সঙ্গে চেন দিয়ে বেঁধে রাখা হত। ছারপোকা কামড়ে গোটা গায়ে ঘা করে দিত। আমিই ওকে ধীরেনবাবুর কাছে নিয়ে যাই। ও একেবারে সুস্থ হয়ে ওঠে। বিয়ে করে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সুখে ঘর করে। আর উগ্রভাব দেখা দেয় নি। কথাবার্তায় ডাক্তারবাবু জানতে পারেন, এক প্রেমঘটিত আঘাতই ছিল ওর মনোরোগের কারণ। আশপাশে কোথাও বিয়ের অনুষ্ঠান হলে সমস্যা বেড়ে যেত, বাড়ত উগ্রতা। বলা বাহুল্য, আমি বা আমার মতো যাঁরা ওঁর কাছে যেতাম, তাঁরা ওঁর জ্ঞানমুগ্ধ এবং গুণমুগ্ধ ছিলাম। বিশ্বাস করতাম, ওঁর কাছে কাউকে পাঠালে সে সুস্থ হয়ে উঠবেই। এবং এটা ঘটনা, যতজনকে পাঠিয়েছি, প্রত্যেকেই সুস্থ হয়ে উঠেছে। কিন্তু উনি বলতেন, রোগীর পরিজনকে ওঁর সম্পর্কে বেশি বাড়িয়ে না বলতে, কারণ সব রোগ বা সব রোগী যে সারে, তার মানে নেই। সেক্ষেত্রে সুপারিশকারী হিসাবে আমার বদনাম হবে। খেয়াল করুন, নিজের বদনাম নয়, আমার বদনাম ছিল ওঁর কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ওঁর চিকিৎসার বিশেষত্ব ছিল সম্মোহন ও অভিভাবন। ইংরেজিতে বললে, হিপ্নোটিজম ও হিপ্নোটিক সাজেশন: 'তুমি ভালো হয়ে যাবে', 'তোমার কষ্ট কমে যাবে', 'কোনো ভয় নেই, কোনো ভাবনা নেই, কোনো চিন্তা নেই'—রোগীদের ভরসা জোগাত, আশ্বস্ত করত।

উৎস মানুষ পত্রিকায় একবার উনি সম্মোহন নিয়ে লিখেছিলেন। তার বিরুদ্ধে লিখেছিলেন স্মরজিৎ জানা। স্মরজিৎদার বক্তব্য ছিল, এটা অবৈজ্ঞানিক। এ নিয়ে দু পক্ষে প্রচুর বাদানুবাদ হয়েছিল। হিপ্নোটিজম নিয়ে ওঁর সঙ্গে প্রচুর আলোচনা হত। কারো মনের খুব জোর থাকলে তাকে সম্মোহিত করা যায় কিনা, গণসম্মোহন হয় কি না ইত্যাদি জানতে চাইতাম। উনি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিতেন কোথায়, কীভাবে, কেমন করে হয়। গণসম্মোহনের ক্ষেত্রে থিয়েটারের উদাহরণ দিতেন। নির্দিষ্ট দূরত্বে বসা, আলো, শব্দ, সংলাপ কীভাবে দর্শককে সম্মোহিত করে বলতেন। উদাহরণ দিতেন, কোনো মৃত্যু দৃশ্যের পর পর্দা পড়লেই সেই অভিনেতা দৌড়ে উইংসের আড়ালে চলে যাবে, এটা জানা সত্ত্বেও আমরা যে শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়ি, তা এক ধরনের সম্মোহনই। জনসভায় ভিড়ে ঠাসাঠাসি হয়ে থাকা মানুষ সহজে সম্মোহিত হতে পারে। নেতারা জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়ে দর্শক-শ্রোতাদের মধ্যে গণ হিস্টিরিয়া তৈরি করতে পারেন। ভীতু যুবক পুলিশের লাঠি বা বন্দুকের সামনে বুক পেতে দিতে পারে, নিরীহ লোক ছুরি হাতে খুন করতে পারে অন্য ধর্ম বা মতের লোককে। ব্যক্তিগত সম্মোহনের ক্ষেত্রে বলতেন, মনের জোর আছে এমন লোককেও সম্মোহিত করা যায়, কারণ সে সম্মোহনকারীর অভিভাবন শোনে। তুলনায় অস্থিরমতি লোক বা শিশুদের চঞ্চলতার কারণে সম্মোহিত করা কঠিন। এই সব তাত্ত্বিক আলোচনা চললেও আমার খুব ইচ্ছা ছিল কীভাবে উনি সম্মোহন করেন, দেখার। উনি যখন রোগীকে সাজেশন দিতেন, আমার থাকাটা শোভন হত না। ঘটনাক্রমে সুযোগ পেয়ে গেলাম। বেশ কিছুদিন ক্যালকাটা টার্ফ ক্লাবে, মানে রেসের মাঠে এটিএল সেলার হিসাবে কাজ করেছি। সেটা আশির দশকের মাঝামাঝি। ঘোড়দৌড় শুরুর কিছুক্ষণ আগে মেশিন বন্ধ হয়ে যায়। ওই সময় বিরাট লাইন পড়ে, খুব তাড়াহুড়ো হয়। প্রথম দিনই, সম্ভবত দ্বিতীয় রেসে ভুল করে কাউকে ৬০ টাকা বেশি দিয়ে ফেলি। তখন টিকিটের ন্যূনতম দাম পাঁচ টাকা। টাকাটা পকেট থেকে দিতে হয়। বেশ নার্ভাস হয়ে পড়ি। রাতে ডাক্তারবাবুকে গিয়ে বলতে উনি হিপ্নোটিক সাজেশন দিলেন, পরে ক্যাসেটও করে দিয়েছিলেন। সেই অভিভাবন শুনে আত্মবিশ্বাস ফিরে পাই। তারপরে বহুদিন রেসের মাঠে কাজ করেছি, আর গ্যাঁটগচ্চা দিতে হয় নি। ধান ভানতে একটু শিবের গীত গাইলাম। কিন্তু সম্মোহন-চিকিৎসা একেবারে যে ভুয়ো নয়, তার প্রমাণ দিতেই এটুকুর অবতারণা। দুবার হিপ্নোটিজম সেশনে ছিলাম। তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া জানার পাশাপাশি, স্বচক্ষে দেখে সম্মোহন সম্পর্কে সামান্য ধারণা হয়েছিল। সদ্যপ্রয়াত এক আগমার্কা যুক্তিবাদী তো ওঁকে অনুনয়-বিনয় করে একদিন দেখেই নিজেকে বিরাট সম্মোহনজ্ঞ বলে ঢেঁড়া পেটাতেন। যা নিয়ে খুব হাসাহাসি করতাম।

(পরের সংখ্যায়)

উমা

জীবিকার স্বার্থে দরকার গো-গবেষণা

প্রদীপ কুমার দাস

বর্তমানে ভারতে পালিত গো-সম্পদ মূলত দুটি ভিন্ন বংশধারা থেকে সৃষ্টি হয়েছিল। দেশীয় প্রজাতির গরুর বৈজ্ঞানিক নাম Bos indicus। সাহিওয়াল, গির, থারপারকার ইত্যাদি জাতের গরুগুলি এই প্রজাতির। জার্সি, হলস্টাইন ইত্যাদি গো-জাতগুলি বিদেশী প্রজাতির। এদের বৈজ্ঞানিক নাম Bos taurus। সংকর গরু এই দুই প্রজাতির মিলনে সৃষ্টি হয়েছে।

প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে বিদেশী প্রজাতির গরু পোষ মানতে শুরু করে (domestication) টার্কি ও ইরান অঞ্চলের আজকের এশিয়া মাইনর এলাকায়। এই ঘটনা ঘটে আজ থেকে প্রায় ১০৫০০ বছর আগে। ইউরোপের বেশিরভাগ গরুই এই অঞ্চল থেকে বিস্তৃত হয়। জেনোটাইপ বিশ্লেষণ করে জানা যায় এদের পূর্বপুরুষরা ছিল বাইসনের মতো দেখতে ঔরকু (Auroch) জাতীয় বন্য প্রাণী। যা ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের গোড়ার দিকে বিলীন হয়ে যায়।

ভারতীয় বা দেশীয় প্রজাতির গরু পোষ মানতে শুরু করে ৮০০০-৯০০০ বছর আগে। গো-ব্যবসা ও বাণিজ্যের স্বার্থে ক্রমে তা দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং পরে আফ্রিকায় ছড়িয়ে পড়ে। বৈজ্ঞানিকদের মতে প্রায় ৫৫০০ বছর আগে নব প্রস্তর যুগে ভারতীয় প্রজাতির কুঁজওয়ালা গরু সিন্ধু উপত্যকা থেকে ইন্দো-গাঙ্গেয় সমভূমি ও দক্ষিণভারতে প্রতিপালন শুরু হয়।

নব প্রস্তর যুগে চাষাবাদ থেকে মানুষজন ক্রমে ছাগল, ভেড়া, শূকর এবং পরে গো-পালনে বেশ উৎসাহ বোধ করে। কারণ, গৃহপালিত প্রাণীর মাংস-দুধ ইত্যাদি আমিষ জাতীয় খাবার খেয়ে মানুষের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ও শ্রম ক্ষমতা বাড়ে। গো-পালন এই বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। কারণ, গরুকে যেমন চাষের কাজে লাগানো যেত, তেমনি দুধ-মাংস থেকে পুষ্টির জোগানও হত। এই সুবিধাজনক দিকগুলি কাজে লাগিয়ে গো-পালন ক্রমে ভারত সহ পৃথিবীব্যাপী জনপ্রিয় ব্যবসা হয়ে ওঠে।

পৃথিবীতে আজ প্রায় ৩৫৪০টি বিভিন্ন জাতের গরু চিহ্নিত হয়েছে। কোনো দৈব বা কাল্পনিক ভাবনায় এই জাতের সৃষ্টি হয় নি। সৃষ্টি হয়েছে বিবর্তনের ধারায়। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে জিনগত পরিবর্তনে (mutation) এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে কৃত্রিমভাবে জিনগত পরিবর্তন করে। এর মধ্যে নির্দিষ্টভাবে বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন গো-জাত হিসাবে চিহ্নিত আছে প্রায় ৮০০টি। ভারতে এই সংখ্যা প্রায় ৫০টি।

উৎপাদন ও অর্থনৈতিক হিসাবে গরুর জাতকে মূলত তিনভাগে ভাগ করা হয়। একটি মাংস উৎপাদনকারী (Beef) গো-জাত। পৃথিবীতে এমন স্বীকৃত গো-জাতের সংখ্যা প্রায় ৮০টি। কম সময়ের মধ্যে এদের শরীরে অতিরিক্ত মাংস সৃষ্টি করা এবং মাংস ও চর্বির আনুপাতিক মান ঠিক রেখে বাজারজাত করার লক্ষ্যে এই জাতগুলি বানিয়েছে বৈজ্ঞানিকরা। উন্নত মানের দুধ উৎপাদনকারী নির্দিষ্ট গো-জাতের সংখ্যা পৃথিবীতে প্রায় ৫০টি। যাদের দুধ প্রদানকালীন গড়ে দৈনিক দুধ উৎপাদন ক্ষমতা ২০ কেজির বেশি। ভারতে এমন ধরনের কোনো জাত না থাকলেও, ভারতীয় জাতের গরুদের মধ্যে প্রায় ১০টি জাতকে চিহ্নিত করা হয়েছে দুধ-উৎপাদক জাত হিসাবে। এরা গড়ে দৈনিক ৫-১০ কেজি করে দুধ দিতে পারে। গো-খাদ্যে নানান পরিবর্তন এনে, জিনগত পরিবর্তন করে, এলাকা উপযোগী নির্দিষ্ট প্রজনন নীতি চালু করেছে। এইসব গো-সম্পদকে কম বয়সে দুধে আনা এবং উচ্চ শক্তিসম্পন্ন দুধ উৎপাদন নিয়ে দেশ-বিদেশের বৈজ্ঞানিকরা দুধেল গরুর জাতের মানোন্নয়নে গবেষণা করে চলেছে। ভারতীয় গো-জাতের সাথে বিদেশী জাতের সংকরায়ণ এই লক্ষ্য নিয়ে চালু হয়েছিল। বাকি গো-জাতগুলির অধিকাংশই উভয় (দুধ-মাংস-পরিশ্রমী) জাতের মিশ্র গুণসম্পন্ন। বিভিন্ন এলাকার আবহ-প্রাকৃতিক পরিবেশের মানানসই করে কম খরচে প্রতিপালনের মাধ্যমে বেশি দুধ উৎপাদনের লক্ষ্যে বর্তমানে নানান গবেষণা চলছে।

এইসব গবেষণার ফলশ্রুতিতে ভারতে গো-দুধের উৎপাদন গড়ে প্রতি বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রায় ৬.২ শতাংশ হারে। বেশ কয়েক বছর ধরে গো-দুগ্ধ উৎপাদনে ভারত বিশ্বে প্রথম। গত ৩০ বছরে দুধের উৎপাদন প্রায় চার গুণ বেড়ে ২০২১-'২২ সালে ২১০ মেট্রিক টন হয়। যা বিশ্বের মোট গো-দুগ্ধ উৎপাদনের প্রায় ১/৪ ভাগ। টাকার অঙ্কে এর পরিমাণ প্রায় ১৫ লক্ষ কোটি টাকা। গো-খামারিদের আরো সংগঠিত করে

জাতীয় আয় বাড়ানোর লক্ষ্যে ভারত সরকার দোহ উন্নয়নে জাতীয় কার্যক্রম (National Action Plan for Dairy Development) নীতি ঘোষণা করেছে। এর মাধ্যমে আগামী ২০২৩-'২৪ সালের মধ্যে বর্তমানের প্রায় ২০ শতাংশ থেকে ৪০ শতাংশ গো-খামারিকে সংগঠিত সরকারি গো-দুগ্ধ সংগ্রহের কর্মসূচিতে আনার পরিকল্পনা নিয়েছে। গো-দুগ্ধ উৎপাদকদের সমবায় সংখ্যা আরো প্রায় ১০ শতাংশ বৃদ্ধির পরিকল্পনা রাখা হয়েছে। যার মূল উদ্দেশ্য হল, উৎপাদিত গো-দুধকে সংরক্ষিত ও প্রক্রিয়াকরণ করে বাজারজাত করে খামারিদের লভ্যাংশ বাড়িয়ে তোলা। সরকারি কোনো পরিকল্পনায় এখনও পর্যন্ত গো-দুগ্ধে সোনা জাতীয় মৌল নিষ্কাশন বা গরুর শ্বাসযন্ত্রের কার্যপ্রণালীতে অক্সিজেনের আধিক্য ঘটানোর রহস্য উন্মোচনের কোনো কর্মসূচি পাওয়া যায় নি। বরং বৈজ্ঞানিকরা ও প্রকৃত গো-খামারিরা সচেষ্ট রয়েছেন স্থানীয় এলাকায় পর্যাপ্ত গো-খাদ্য উপাদানকে ব্যবহার করে গো-পালনের খরচ কমানোর প্রণালী উদ্ভাবনে। পাশাপাশি, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সচেষ্ট রয়েছে সরকারি নীতি অনুযায়ী কৃত্রিম গো-প্রজননের মাধ্যমে এলাকা অনুযায়ী নির্দিষ্ট দুধেল জাতের গো-সম্পদ সৃষ্টিতে। ভারতীয় গো-খামারিরা এই নীতি অনুসরণ করার শেষ দু'টি প্রাণী সুমারিতে দেখা যায় দেশে দুধেল গরুর সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ১৮ শতাংশ। অন্যদিকে বলদ গরু বা ষাঁড়ের সংখ্যা কমেছে প্রায় ৩০.২ শতাংশ।

ভারতে মাংস উৎপাদনের জন্য কোনো গো-জাত নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত হয় নি। ভারতীয় গো-কসাই-এর নির্দিষ্ট আইন কিছু রাজ্যে প্রযোজ্য হচ্ছে। আইন মোতাবেক বলদ ও ১৪ বছর উত্তীর্ণ অনুৎপাদক গো-সম্পদ কসাইযোগ্য শংসাপত্রের প্রেক্ষিতে কসাই হয়। এতে মাংস, চামড়া, রক্ত সহ বিভিন্ন কসাইজাত দ্রব্য থেকে বহু মানুষ জীবিকা অর্জন করতে পারছে। ২০২২ সালে ভারতে কসাইখানা জাত গো-মাংস উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে প্রায় ৪.২৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, শেষ ১০ বছরে ভারতে বার্ষিক গো-কসাই বৃদ্ধির হার কমেছে। ২০০৩-২০১২ সালে গড়ে প্রতি বছর গো-কসাই বৃদ্ধির হার ছিল ৬.০৫ শতাংশ। পরের ১০ বছরে, ২০১৩-২০২২-এ এই হার কমে দাঁড়িয়েছে ২.২৬ শতাংশে। ফলে ১৪ বছরের কমবয়সি ও ১৪ বছরের বেশি বয়সি অনুৎপাদক গরু এবং বলদ প্রতিপালনের ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গীতে লাভজনক না হওয়ায় দেশে মালিক-বিহীন রাস্তায় চরা গো-সম্পদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। খাবার ও চিকিৎসার খরচের সংকুলানের ঘাটতিতে এই সংখ্যা বাড়ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের লোকসভায় পরিবেশিত এক তথ্যে জানা গেছে দেশে এমন ছাড়া-গরুর সংখ্যা ৫০ লক্ষের বেশি। এতে রাস্তায় দুর্ঘটনা বাড়ছে— বাড়ছে জুনোটিক রোগ সংক্রমণের ঘটনা।

এই প্রসঙ্গে আলোচনা দরকার গো-পালনকে কেন্দ্র করে কিছু বিভ্রান্তিকর খবরের। গো-মাংস, গোবর, গোময় ইত্যাদি বিষয়ে বিভ্রান্তি বেশি। মুরগি বা পাখি মাংস ছাড়া অন্য সব প্রাণীর (মূলত স্তন্যপায়ীদের) মাংসে লাল রঙের মায়োগ্লোবিন বেশি থাকায় তাদের রেড মিট বলা হয়। গরু, ছাগল, ভেড়া, শূকর-এর মাংস রেড মিট। এদের মাংসে ফ্যাট বা কোলেস্টেরল বেশি থাকায় বিশেষজ্ঞরা সর্বদা পরিমিতভাবে রেড মিট খেতে বলেন। ফলে গো-মাংস খেলে শারীরিক ক্ষতি অন্য রেড মিটের চেয়ে কম-বেশি হতে পারে এমন বিচার করা অনুচিত।

গো-খাদ্য উৎপাদন খরচ থেকে শুরু করে ওষুধ সহ গো-প্রতিপালনের নানান খরচবহুল পরিমাণে বেড়ে চলেছে। গবেষকরা বলছেন গো-পালনে লাভের মূল চাবিকাঠি রয়েছে শ্রমের ব্যবহার কমানোর মধ্যে। ফলে, বেশি সংখ্যায় গো-পালনে মূলত লাভ থাকছে। লাভ বাড়ানোর জন্য গবেষণা চলছে গো-খাদ্য খরচ কম করে জৈব-প্রযুক্তির সাহায্যে দুধের উৎপাদন বাড়ানোর। এই প্রেক্ষাপটে উপযুক্ত দুধ দিতে অক্ষম বা দু-চারটি গরু বাড়িতে রেখে জমিতে সার দেওয়ার জন্য গোবর ব্যবহার করা, অথবা গোময় ব্যবহার করে ক্যান্সার ও যৌন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার নিয়ামক হিসাবে গো-পালন একেবারেই অলাভজনক ব্যবসা। গবেষকরা একথাও বলছেন, ভারতীয় সাহিত্যে 'পঞ্চগব্য'-র যে বৈচিত্র্যময় রূপ তুলে ধরা হয় তা যথাযথ বিজ্ঞানসম্মত নয়। গো-পালনে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও অন্যান্য গ্রীন হাউস গ্যাসের নিঃসরণ এমনিতেই অন্যান্য গৃহপালিত প্রাণীর থেকে বেশি। কাজেই অনুৎপাদক গো-সম্পদকে কেবলমাত্র গোময়, গোচনা পাওয়ার জন্য প্রতিপালন করা পরিবেশের পক্ষেও বিপদজনক।

তাই কোনরকম আবেগে নয়, বাস্তব পরিস্থিতি বিচার করে জীবিকা ও ব্যবসায়িক স্বার্থে গো-সম্পদের অর্থনৈতিক মূল্য বিবেচনা করে সুনির্দিষ্ট গো-গবেষণা ও নীতি গ্রহণ করা দরকার।

উ মা

পরিবেশ রক্ষায় অদৃশ্য সৈনিক —এক বিপন্ন জনগোষ্ঠী

শ্রেয়সী দাশগুপ্ত

পরিচ্ছন্নতা পরিবেশ রক্ষায় অপরিহার্য হলেও, বর্জ্য নিষ্কাশনকে সামগ্রিকভাবে অত্যন্ত নিচুমানের কাজ হিসাবেই গণ্য করা হয়। পরিচ্ছন্নতাকে পবিত্রতার সমতুল্য মনে করা হলেও, যাদের কারণে তা সম্ভব হয়, তারা কিন্তু অদৃশ্যই থেকে যান, সমাজে তাদের জায়গা হয় সবার নীচে। পৌরব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হল নাগরিক জীবনের সবরকম স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করা। এই ব্যাপারে একটা মূল সমস্যা অবশ্যই কঠিন বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা (Solid Waste Management)। প্রতিদিন যে বিপুল পরিমাণ আবর্জনা উৎপন্ন হয়, তার সদ্গতির জন্য প্রতিটি পুরসভার একটা নিজস্ব পরিকাঠামো থাকে। সাফাইকর্মীদের সাহায্যে এই আবর্জনা সংগ্রহ করে শহরের বাইরে কোনো নীচু বা জলা জমি ভরাট করাটাই আমাদের দেশে প্রচলিত রীতি। এই পদ্ধতিতে খুব একটা বাছাইয়ের (waste segregation) সুযোগ থাকে না। ইদানিং অবশ্য পচনশীল এবং অপচনশীল— এই দুই ভাগে আলাদা করে সংগ্রহের ব্যবস্থা চালু হয়েছে, কিন্তু তার বেশি করা মূলত অর্থনৈতিক কারণেই সম্ভব নয়। এই বিপুল পরিমাণ বর্জ্যের একটা বড় অংশ অবশ্যই পুনর্ব্যবহারযোগ্য, যা জীবিকার অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে আর এক জনগোষ্ঠী—নাগরিক সমাজে যাদের পরিচয় 'কুড়ানি' হিসেবে। পুরকর্মী না হয়েও এই স্বনিযুক্ত ও অসংগঠিত কুড়ানিরা জমা করা বর্জ্যের পাহাড় থেকে পুনর্ব্যবহারযোগ্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো বাছাই করে আলাদা করার মধ্যে দিয়ে শহুরে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। বিনিময়ে তাদের প্রাপ্তি নিতান্তই নগণ্য। স্বনিযুক্ত হলেও এই জনগোষ্ঠী কিন্তু আইনস্বীকৃত, ২০১৬ সালে প্রকাশিত Solid Waste Management-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী— waste picker is a "person or group of persons informally engaged in collection and recovery of reusable and recyclable solid waste from the source of waste genetation - the streets, bins, material recovery facilities, processing and waste disposal facilities forsale to recyclers directly or through intermediaries to earn their livelihood". [Rule3 (1) (58)]। এই কুড়ানিদের একটা বড় অংশ দলিত বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের হলেও, উচ্চবর্ণের মানুষরাও আছেন এই দলে। অবশ্য সামগ্রিকভাবে সকলেই তাঁর সামাজিকভাবে অদৃশ্যই। দারিদ্র্য, অশিক্ষা আর বিশেষ কর্মদক্ষতার অভাব তাদের কিছুটা বাধ্য করেছে এই জীবিকা বেছে নিতে। কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার একেবারে নীচের স্তরে থাকা এই মানুষগুলোর না আছে কোনো সামাজিক স্বীকৃতি, না আছে কোনো নাগরিক অধিকার। তা সত্ত্বেও প্রতিনিয়ত অত্যন্ত প্রতিকূল, বিপদসংকুল ও বিষাক্ত পরিবেশে এই প্রান্তিক মানুষগুলো নীরবে করে চলেছেন তাদের কাজ। কিছুটা নিজের অজান্তেই রক্ষা করে চলেছেন পরিবেশের ভারসাম্য।

যোজনা আয়োগের ২০১৪ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভারতবর্ষে ৭৯৩৫টি শহরে প্রায় ৩৭ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষ বছরে ৬ কোটি ২০ লক্ষ টন আবর্জনা উৎপাদন করেন। ২০৩১ সালে এর পরিমাণ গিয়ে দাঁড়াবে ১৬ কোটি ৫০ লক্ষ টন, আর ২০৫০ সালে প্রায় ৪৩ কোটি ৬০ লক্ষ টন। ভারতের প্রধান ছয়টি নগরে সমীক্ষা করে দেখা গেছে এই বিপুল পরিমাণ বর্জ্যের ৬৬ শতাংশই এই কুড়ানিদের কল্যাণে পুনর্ব্যবহারযোগ্য হয়ে ওঠে। এই পরিসংখ্যানই বুঝিয়ে দেয় নাগরিক পরিবেশ রক্ষায় এই 'অদৃশ্য' মানুষগুলোর অবদান কতটা। পৌরসংস্থার কর্মীদের মতো এদের না আছে কোনো মাসিক বেতনের ব্যবস্থা, না আছে কোনো দিনমজুরি। সারা দিনে কুড়িয়ে পাওয়া জিনিসগুলো বাজারে বিক্রি করেই তাদের দিন গুজরান হয়। বিশ্বের অন্যান্য দেশে এই পেশা পুরুষপ্রধান হলেও, এদেশে মুখ্যত মহিলারাই এ কাজ করে থাকেন। ২০১২-১৩ অর্থবর্ষের একটি সমীক্ষা অনুযায়ী কলকাতা শহরে বর্জ্য সংগ্রহের কাজে লিপ্ত জনগোষ্ঠীর একটা বড় অংশই হল মহিলা এবং শিশু এবং বহুক্ষেত্রে তাদের সংসারের জোয়ালটা তাদের কাঁধেই থাকে। বিভিন্ন গবেষণা ও সমীক্ষার ফলাফলেও এই ছবিটাই উঠে আসে, যার মধ্যে উল্লেখ্য দেবারতি বাগচীর ২০১৬ সালে প্রকাশিত গবেষণাপত্র, ধ্রুবজ্যোতি ঘোষের ২০১৭ সালে প্রকাশিত The Trash Diggers ও নন্দিনী সেনের ২০১৮ সালে প্রকাশিত Urban Marginalisation in South Asia Waste Pickers in Kolkata বই দুইটি।

ধাপার মাঠ— ১৮৬৫ সালে, তৎকালীন ব্রিটিশ শাসকেরা কলকাতা নগরীর পূর্ব সীমানার কিছুটা দূরে ধাপায় এক বর্গমাইল (Dhapa square mile) জলা জমি নির্দিষ্ট করেছিলেন শহরের দৈনন্দিন আবর্জনা ফেলার জন্য। সময়ের সাথে সাথে কলকাতা মহানগরীর অনেক পরিবর্তন ঘটে গেলেও, আজও ঐ ধাপার মাঠ রয়ে গেছে তার স্বমহিমায়, শুধু ব্যাপ্তিতে কিছুটা হয়ত বেড়েছে শহরের ক্রবর্ধমান আবর্জনার সঙ্গে পাল্লা দিতে। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে, এই ধাপার মাঠে কিছু মানুষকে নিয়োগ করা হয়েছিল মূলত কাগজ শিল্পে ব্যবহারযোগ্য বর্জ্য সংগ্রহের কাজে। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এ কাজের ব্যাপ্তি বিস্তৃতি লাভ করে। বর্তমানে কলকাতা মহানগরীতে আবর্জনা উৎপাদনের হার দৈনিক গড়ে প্রায় ৪০০০ মেট্রিক টন, যার প্রায় ৫০ শতাংশ বর্জ্যই পুনর্ব্যবহারযোগ্য হিসাবে সংগ্রহ করা হয়।

সরকারিভাবে কলকাতার প্রতিটি ওয়ার্ডে ১৫ জন করে রেজিস্টার্ড কুড়ানি বহাল করা হয় ময়লার ভ্যাটে বাছাই-এর কাজ করার জন্য। এর বাইরে যে সমস্ত কুড়ানি বিভিন্ন ওয়ার্ডে সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে কাজ করে, তাদের প্রায়শই চুরির দায়ে পুলিশি হয়রানির শিকার হতে হয়। যাই হোক, ধাপার কুড়ানিরা কিন্তু কলকাতার অন্যান্য অঞ্চলে কর্মরত কুড়ানিদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা একটি গোষ্ঠী, যাদের কাজ ধাপার আবর্জনার স্তূপেই সীমাবদ্ধ। এরা স্বনিযুক্ত, এক আনরেজিস্টার্ড ও অসংগঠিত শ্রমিকগোষ্ঠী, যারা সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও এভাবেই কাজ করতে পছন্দ করে।

ধাপার কুড়ানিদের দিন শুরু হয় সূর্যোদয়ের আগে, 'টাইম কলে' জলের লাইন দিয়ে। সকাল সাতটার মধ্যে তারা পৌঁছে যায় ধাপার মাঠে, স্তূপীকৃত আবর্জনার থেকে বেছে নেয় চামড়া, রবার, প্লাস্টিক, কাঁচ ও ধাতব জিনিস; দিনের শেষে 'কাবাডিওয়ালা'দের কাছে বিক্রির উদ্দেশ্যে। বিক্রয়মূল্য ধার্য করার অধিকার অবশ্য এক্ষেত্রে ক্রেতার। অশিক্ষিত মহিলারা বাধ্য হয় সেই মর্জির কাছে আত্মসমর্পণ করতে। দিনের শেষে প্রাপ্তি গড়ে ১৫০ থেকে ৩০০ টাকা, বলাই বাহুল্য যা প্রাপ্যর থেকে অনেকটাই কম। এই সামান্য উপার্জনে, প্রচণ্ড আর্থিক অনটনের মধ্যে থেকেও বিকল্প জীবিকা বেছে নেওয়ার ব্যাপারে এদের মধ্যে ভীষণ অনীহা দেখা যায়। বর্তমান জীবিকায় সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতাই এই আপত্তির মূল কারণ। তাদের মতে, কাজের সময় ঠিক করা, কাজে যাওয়া না যাওয়া, এমনকি দৈনিক রোজগারের পরিমাণ ঠিক করা সবই তারা নিজের ইচ্ছেমতো করতে পারে; কারুর কাছে তাদের কৈফিয়ত দিতে হয় না। কোনো নিয়োগকর্তার অধীনে অন্য ধরনের অসংগঠিত কাজ করলেও, যেমন পরিচারকের কাজেও তাদের এই স্বাধীনতা থাকবে না। কিন্তু এর একটা অন্য দিকও আছে, কিছুটা অজ্ঞতার কারণে যা তারা বুঝতেও চান না। এই স্বাধীনতার বিনিময়ে তারা ন্যূনতম মজুরি বা সবেতন ছুটি (মাতৃত্বকালীন, অসুস্থতা বা অন্যান্য জরুরি কারণে)-র মতো বেশ কিছু প্রয়োজনীয় সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

কুড়ানিদের অধিকাংশই মহিলা হওয়ার কারণে, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার প্রশ্নটা এসেই যায়। সে ব্যাপারেও তাদের বক্তব্য, তাদের কাজের জায়গা সম্পূর্ণভাবেই নিরাপদ, বিশেষ করে যৌন নির্যাতনের কোনো আশঙ্কা নেই সেখানে; একমাত্র দুর্ঘটনাজনিত বিপদের আশঙ্কাই রয়ে যায় তাদের দৈনন্দিন জীবনে। কিন্তু কিসের বিনিময়ে এই স্বাধীনতা? তারা বঞ্চিত হচ্ছেন শ্রমিক হিসাবে তাদের সামাজিক স্বীকৃতি থেকে, তাদের অবদান থেকে যাচ্ছে অদৃশ্যই। সরকার প্রদত্ত বিশেষ কিছু সুযোগসুবিধা— যেমন, বাধ্যতামূলক পিপিই কিট, পরিচয়পত্র, স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি সম্পর্কেও তারা যথেষ্ট ওয়াকিবহাল নন। ২০১৬ সালে প্রকাশিত Solid Waste Management অনুযায়ী এই সমস্ত সুযোগসুবিধা পাওয়ার প্রয়োজনে সমস্ত অসংগঠিত কুড়ানিরই নিবন্ধিকরণ জরুরি। সব জীবিকাতেই কিছু পেশাগত বিপর্যয়ের সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু এক্ষেত্রে না আছে কর্মক্ষেত্রে কোনো প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা, না আছে কোনো বিমার ব্যবস্থা। তাই কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে তাদের ছুটে যেতে হয় কাছের কোনো সরকারি হাসপাতালে, কখনো কখনো চিকিৎসার প্রয়োজনে ধারদেনাও করতে হয়।

প্রামাণ্য নথি না থাকায় এই অসংগঠিত কুড়ানিদের প্রকৃত সংখ্যাটা বলা সম্ভব নয়। এই জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নতির জন্য Tiljala SHED, Waste Pickers Association of Kolkata, DISHA এবং আরও অনেক সংস্থার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এদের সামগ্রিক অবস্থা অপরিবর্তিতই থেকে গেছে, তারা সমাজ ও প্রশাসনের অগোচরেই রয়ে গেছেন। ২০১৪ সালে কলকাতা নগর নিগমের Clean city campaign প্রকল্পের অধীনে Modern scientific Waste compacting station (MSWCS) এর সূচনার সঙ্গে সঙ্গে এই বর্জ্যকর্মীদের জীবনে নেমে এসেছে এক ঘোর অনিশ্চয়তা। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য কলকাতাকে 'গার্বেজ ভ্যাট ফ্রি' শহরে রূপান্তরিত করা। এর ফলে প্রতি ওয়ার্ডে যে গড়ে ১৫ জন

বর্জ্যকর্মীর কর্মহীন হয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়ে যাচ্ছে, এই প্রকল্প রূপায়নের সময় সেই সমস্যাটা পুর প্রশাসনের বিবেচনাতেই আসে নি। ২০১৬ সালে প্রকাশিত সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট রুলস্-এ এই অসংগঠিত জনগোষ্ঠীকে স্বীকৃতি দিয়ে পৌরপ্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিকাঠামোয় অন্তর্ভুক্তির কথা বলা হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত আর্থিক সংস্থানের অভাবে কোনো পৌরসংস্থার পক্ষে এককভাবে তা করে ওঠা সম্ভব হয় নি। বিভিন্ন এনজিওর সহযোগিতায় তা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দিল্লির Chintan Environmental Research and Action Group-এর মতো বিভিন্ন সংস্থা ও নাগরিক সমাজ এগিয়ে এসেছেন তাদের জীবনযাত্রার সার্বিক উন্নতির প্রচেষ্টায়। এর অনেক আগেই কুড়ানিদের উন্নতিকল্পে গড়ে উঠেছিল পুনের KKPKP (Kagad Kach Patra Kashtakari Panchayat) এবং ব্যাঙ্গালোরের Hasiru Dala-র মতো কুড়ানিদের নিজস্ব কিছু সংগঠন। এই সংগঠনগুলির মূল লক্ষ্য হল প্রতিটি কুড়ানির স্বীকৃতি, সেই উদ্দেশ্যে তাদের পরিচয়পত্রের ব্যবস্থা করা, সঠিক প্রাপ্য নির্ধারণ করা, তাদের সংগঠিত করা, পৌর কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে তাদের সমন্বয় গঠন ও সামগ্রিকভাবে তাদের জীবনযাত্রার উন্নতিসাধন। শুধু তাই নয়, তাদের কাজের তাৎপর্য ও পরিবেশ রক্ষায় তাদের ভূমিকার ব্যাপারে প্রতিটি বর্জ্যকর্মীকে ওয়াকিবহাল করার মতো শিক্ষামূলক প্রচেষ্টাতেও এই সংগঠনগুলির অবদান যথেষ্ট। এতো প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, দুর্ভাগ্যবশত কিছু সংখ্যক কুড়ানির মধ্যে সংগঠিত হওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট অনীহা দেখা যায়। সাংগঠনিক অনুক্রম মেনে চলতে গেলে তাদের দৈনন্দিন কর্মজীবন অনেক বিধিনিষেধের আওতায় চলে আসতে পারে, এই আশঙ্কাই তাদের সংগঠিত হওয়ার ব্যাপারে আপত্তির প্রধান কারণ। রাজনৈতিক সচেতনতার অভাব আর সাংগঠনিক দুর্বলতাই তাদের সংহতির ক্ষেত্রে মূল অন্তরায়। ফলে তাদের অবস্থার উন্নতির সম্ভাবনা সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে অন্য কোনো সাংগঠনিক বা ব্যক্তিগত উদ্যোগের উপর। কিন্তু কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গে কুড়ানিদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্য বিভিন্ন এনজিও-দের ঐকান্তিক চেষ্টা সত্ত্বেও কুড়ানিদের মধ্যে উদ্দীপনা আর নেতৃত্বের অভাবে তা ফলপ্রসূ হয় নি। কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় কুড়ানিদের স্বীকৃতি অধরাই রয়ে গেছে। ২০২১ সালে প্রকাশিত কলকাতা নগর নিগমের District Environment Plan-এ তাই এদের কোনো উল্লেখই পাওয়া যায় না। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক উদাসীনতার কারণে এই কুড়ানিরা তাদের মৌলিক অধিকার ও সুযোগসুবিধা থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। সামগ্রিকভাবে বিচার করলে এই জনগোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ এক বিরাট অনিশ্চয়তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সংগৃহীত সামগ্রীর ন্যূনতম বিক্রয়মূল্য নির্ধারিত না হওয়ায় তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির কোনো সম্ভাবনাই প্রায় নেই বললেই চলে। ফলে ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জীবধারণ করা তাদের কাছে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ছে। তার সঙ্গে রয়েছে বিভিন্ন পেশাগত বিপত্তি। দীর্ঘ সময় ধরে বিষাক্ত পরিবেশে কাজ করার ফলে তাদের মধ্যে চর্মরোগ, শ্বাসকষ্ট, হাতে পায়ে ব্যথা ইত্যাদি বিভিন্ন দীর্ঘমেয়াদি রোগের পুনরাবৃত্তি ও প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। কর্মস্থানে বিভিন্ন দুর্ঘটনায় তাদের হতাহতের ঘটনাও থেকে যায় অজানা। এসবের পরেও তারা অনেক বেশি চিন্তিত তাদের পেশার ভবিষ্যৎ নিয়ে।

কলকাতা নগরের বিস্তৃতি, কলকাতার পূর্বে গড়ে ওঠা নতুন নতুন উপনগরী, ধাপার মাঠের ভবিষ্যতকেও ঠেলে দিয়েছে এক অনিশ্চয়তার দিকে। Modern Scientific Waste Compacting Station-এর প্রবর্তন তো সেই ইঙ্গিতই বহন করে। কোনো সামাজিক স্বীকৃতি না থাকার কারণে তাদের পুনর্বাসনের সম্ভাবনাও নেই। সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার হল এই কুড়ানিরা ভোটার হওয়া সত্ত্বেও সব রাজনীতিকরাই এদের সুযোগ সুবিধার বিষয়ে উদাসীন। এতো অনিশ্চয়তার মধ্যেও তারা পরিবেশ রক্ষায় নীরব সৈনিকের মতো কাজ করে চলেছে সকলের অলক্ষ্যে। কিন্তু সেই অবদানের স্বীকৃতি?

উ ম্া

গ্রাহকদের প্রতি

উৎস মানুষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে গ্রাহক চাঁদা জমা দিয়ে অনেকেই নাম, ঠিকানা জানান না। তাই গ্রাহকদের জানানো হচ্ছে, আপনারা অবশ্যই আপনাদের নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ বা ইমেইলে জানাবেন। নইলে আমাদের পক্ষে পত্রিকা পাঠানো সম্ভব না।

জঙ্গলের আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ওজোন স্তর

নন্দগোপাল পাত্র

বসন্তে গাছের পাতা ঝরবে এ হল প্রকৃতির স্বাভাবিক ঘটনা। আর এসময়ে দেখা যায় জঙ্গলে আগুন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই আগুন লাগার পেছনে মানুষের হাত রয়েছে বলে অনুমান। কখনো কখনো সেই আগুন ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের রূপ নেয়। প্রতি বছরই দেখা যায় কয়েক লক্ষ হেক্টর বনভূমি সেই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। আগুনের লেলিহান শিখা প্রথমে শুকনো পাতার সাহায্য নিয়ে ধীরে ধীরে বনভূমির নীচে আধা শুকনো গাছ, গুঁড়ি, পড়ে থাকা কাঠ থেকে শক্তি সংগ্রহ করে ক্রমে রুদ্রমূর্তি ধারণ করে। তারপর তার সাম্রাজ্য বিস্তারে নানান সবুজ লতা-পাতা, ছোট-ছোট নানান প্রজাতির গাছ, গাছের চারা, বর্ষার সময় গজিয়ে ওঠার অপেক্ষায় আগামী নতুন উদ্ভিদের কন্দ, বীজ ও মূল, মাটির নানান উপকারী জৈব-অজৈব পদার্থ, প্রাণীদের জ্বলিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে এগিয়ে যায় আরও সামনে। ছড়িয়ে পড়ে বনভূমির অন্য প্রান্তে। প্রথমেই এ আগুন নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে পরে এর ভয়ঙ্কর শক্তি বাগে আনা বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। বিশেষ করে যদি বাতাসের গতিবেগ ভাল থাকে। যেমনটি হয়ে থাকে ব্রাজিলে আমাজনের বনে।

অন্যদিকে এই লেলিহান আগুনে বন্যপ্রাণীরা ভয় পেয়ে দিকভ্রান্ত হয়ে ছুটতে থাকে। হারিয়ে যায় ওদের বাসস্থান, মারা পড়ে ওদের ছোট বাচ্চারা। এমনকি, বড় প্রাণীরা অনেকেই হয় আংশিকভাবে মারাত্মক ঝলসে যায়, না হয় একেবারেই মারা পড়ে। আতঙ্কের রেশেই অনেক প্রাণীর বংশবৃদ্ধিও ব্যাহত হয়। গাছে বাসা করে থাকা পাখিরা আগুনের হাত থেকে বাঁচতে যে দিকে পারে পালাতে থাকে। যারা পারে না তারা মারা পড়ে। মাটির উপরিভাগ পুড়ে পাথরের মতো নিষ্প্রাণ, ভঙ্গুর এবং জৈব-অজৈব পদার্থবিহীন হয়। বড় বড় গাছের কান্ডের উপর তার একমাত্র সংবহনপ্রণালী তন্ত্রের পুরু ছাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে তার শারীরবৃত্তীয় কাজ ব্যাহত হয়। ব্যাহত হয় তার বৃদ্ধি, পরিপাকপ্রণালী এবং বংশবৃদ্ধির নানান প্রয়াস। বেশ কিছু গাছ মারা পড়ে। মাটির উপর ছড়িয়ে মাটিকে আঁকড়ে থাকা শিকড়ের জাল পুড়ে ছিন্ন হয়ে যায়। আলগা হয় মাটি, পরবর্তী বর্ষায় প্রবল ভূমিক্ষয় দেখা দেয়। দেখা যায় বৃষ্টির জল ধরে রাখার অক্ষমতা। আগুনের ফলে সৃষ্ট কার্বন ডাই অক্সাইড, কার্বন মনো-অক্সাইড সহ পরিবেশের ক্ষতিকারক নানান গ্যাস ছড়িয়ে পড়ে বনের চারদিকে। যার পরিমাণ কয়েক লক্ষ গাড়ির ধোঁয়ার সমান। সব মিলে বনে লেগে যাওয়া আগুনে ক্ষতির পরিমাণ মাপলে চমকে উঠতে হবে। এক কথায় অপূরণীয় ক্ষতি হয় পরিবেশের।

সম্প্রতি নেচার পত্রিকায় 'ক্লোরিন অ্যাক্টিভেশন অ্যান্ড এনহ্যান্সড ওজোন ডিপ্লিশন ইনডিউসড বাই ওয়াইল্ড ফায়ার এরোশেল' (ভলিউম ৬১৫, ৯ মার্চ ২০২৩) শীর্ষক গবেষণাপত্রে সাত জন বিজ্ঞানী 'কমিউনিটি এরোশেল অ্যান্ড রেডিয়েশন মডেল ফর অ্যাটমোস্ফিয়ার' এবং 'কমিউনিটি আর্থ সিস্টেম মডেল'-এর মাধ্যমে দেখিয়েছেন দাবানলের ফলে উৎপন্ন 'এরোশেল' এবং বায়ুমণ্ডলে থাকা অন্যান্য রাসায়নিক উপাদান ক্লোরিন নির্গত করে। ওই ক্লোরিন অতিবেগুনি রশ্মির সঙ্গে মিশে গিয়ে ওজোন স্তরের ব্যাপক ক্ষতি করে। ফলে ওজোন স্তরের গর্ত ক্রমশ বড় হতে থাকে। ওজোন স্তর ক্ষতিকারক অতিবেগুনি রশ্মিকে আটকায়। এই স্তরের গর্ত বা গহ্বর বড় হওয়ার ফলে অতিরিক্ত মাত্রায় অতিবেগুনি রশ্মি প্রবেশ করে ভূপৃষ্ঠে পৌঁছায়। ফলস্বরূপ ক্যানসার সহ একাধিক রোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষির উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায় এবং বাস্তুতন্ত্রের উপর সার্বিক বিপর্যয় নেমে আসে। ওজোন স্তরের এই পরিবর্তন বিশ্বের পরিবেশের কাছে অবশ্যই উদ্বেগের বিষয়। কানাডার ওয়াটারলু বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন, ওজোন স্তরের যে গর্ত ছিল, তা অনেকটাই বড় আকার নিয়েছে। ওই গবেষকদের মতে, শেষ বারের তুলনায় প্রায় সাত গুণ বড় হয়েছে গর্তটি।

প্রাকৃতিক দাবানল রোখার বিষয়ে আমাদের করণীয় কিছু নেই। তা প্রাকৃতিক নিয়মেই হবে, যদি হওয়ার থাকে। কিন্তু বর্তমানে দেখা যায়, বনে ভয়াবহ আগুন লাগার ঘটনার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা ইচ্ছাকৃতভাবে সংঘটিত হতে দেখা যাচ্ছে। মুনাফা লাভের আশায় অসাধু চক্রের লোকজন জঙ্গলের গাছ কাঠ চুরি করে পাচারের উদ্দেশ্যে ঝরাপাতা পুড়িয়ে জঙ্গল সাফ করে দেয়। আবার অনেক সময় বন্যপ্রাণী শিকারের উদ্দেশ্যেও অনেকে জঙ্গলে আগুন ধরিয়ে দেয়। যাতে বন্যপ্রাণীরা প্রকাশ্যে আসতে পারে। এই আগুন বন্ধ করতে হলে চাই সচেতনতা। এর সঙ্গে জরুরি রাষ্ট্রীয় বা প্রাশাসনিক উদ্যোগ। আবার আমাদের নিজেদের দিক থেকে অর্থাৎ সমাজের প্রতিটি ক্ষুদ্রতম একক থেকেও উদ্যোগটা উঠে আসা জরুরি। না হলে পরিবেশ নিয়ে সঙ্কট দ্রুত গভীরতর হবে। উমা

হারিয়ে গেল উত্তরবঙ্গের চা-বাগানের সংস্কৃতিচর্চা

তমোজিৎ রায়

গোড়ার কথা ঃ দার্জিলিং বাদ দিয়ে প্রায় ৩০০-র কিছু বেশি বাগান রয়েছে তরাই-ডুয়ার্স অঞ্চলে মূলত জলপাইগুড়ি, কোচবিহারে কিছুটা আর হালে গড়ে ওঠা নতুন জেলা আলিপুরে। মূলত চা-বাগানের বাঙালি করণিক শ্রেণী মানে বাগানিয়া বাবুদের অবসর যাপনের মাধ্যম হিসেবেই গড়ে উঠেছিল তরাই ডুয়ার্সের চা বলয়ের নাট্য উদ্যোগ। বিনোদনই যদিও প্রধান উদ্দেশ্য, তবুও অনেকেই বেশ ধারাবাহিকভাবেই থিয়েটারের কাজ করেছিলেন। ইতিহাস ঘেঁটে দেখা যাচ্ছে, ডুয়ার্সের নাট্যচর্চা তার শতবর্ষ অতিক্রম করেছে ২০১৬-তে। পশ্চিম ডুয়ার্সের গঞ্জ শহর ওদলাবাড়িতে শুরু হয়েছিল 'মেবার পতন' নাটকের মহড়া ম্যারাপ বেঁধে ১৯১৬-র মাঝামাঝি, সে যুগের স্বদেশিয়ানাকে হাতিয়ার করে। বাগানবাবুরা ও পূর্ববঙ্গীয় শিক্ষিত বাঙালি কাষ্ঠ ব্যবসায়ী—এঁদের পৃষ্ঠপোষকতায়ই বহমান হয়েছে এই অনুন্নত, ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত ডুয়ার্সের নাট্যধারা। মূলত তাঁদের অর্থানুকূল্যেই বানারহাট, মালবাজার, ডামডিম, চালসা, গয়েরকাটা, মেটেলি, ওদলাবাড়ি সহ অনেক বাগানে, বা বাগান-শহরে গড়ে উঠেছিল অনেক কাঠের তৈরি আধুনিক মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহ। কখনো মধ্যবিত্ত ঘেরাটোপের বাইরে গিয়ে শ্রমিক মহল্লায়ও ছড়িয়ে পড়েছিল এর উন্মাদনা। উজ্জ্বল ব্যতিক্রম স্বরূপ দু'একটি বাগানে শুধু বিনোদন নয় শ্রমিকরা প্রতিবাদের ভাষা হিসেবেও বেছে নিয়েছিলেন থিয়েটারকে। বিন্নাগুড়ি চা বাগানে চা শ্রমিকদের মধ্যে সচেতনতা বিস্তারের জন্য সিটুর উদ্যোগে গঠিতে হয়েছিল ওয়ার্কার্স থিয়েটার। 'সুরঙ্গ মে আগ' নাটকটি তৈরি করে নানা বাগানে নাটকটি তাঁরা করে বেড়ান। এই নাটকে মিশে গিয়েছিল হিন্দি, নেপালি, মদেশিয়া সংলাপ, যা সব অর্থেই বৈপ্লবিক। টানা চার বছর ধরে এই নাটক চলেছিল। ৮০র দশকের মধ্যভাগে কালচিনিতে গড়ে উঠেছিল একটি ব্যতিক্রমী ক্লাব— 'মজদুর মৈত্রী সঙ্ঘ'। বাগানের ক্লাব বলতে আমরা সাধারণত বাঙালি বাগানবাবুদের ক্লাবই দেখে থাকি বা দেখে এসেছি। কিন্তু কালচিনিতে সম্ভবত প্রথম ও একমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর সাংস্কৃতিক সংস্থা গড়ে উঠেছিল, যাঁরা লোকগান, লোকনৃত্যর পাশাপাশি নাটকও করেছেন মূলত নেপালি ভাষায়। বিখ্যাত সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কাজি মানগোলেই ছিলেন এই কর্মযজ্ঞের মূল হোতা। তাঁর যোগ্য সঙ্গী ছিলেন বিমল বাহাদুর গুরুং। নিজেদের নাটকের পাশাপাশি তাঁরা আয়োজন করতেন নেপালি নাটকের উৎসব ও প্রতিযোগিতা। এই যে 'ছিল', 'করতেন' বলছি, এর কারণ খুব কম বাগানেই এখনও টিকে আছে নাট্য তথা সংস্কৃতি চর্চা, তাও টিমটিম করে। শ্রমিক মহল্লায়ও তেমন করে বেজে ওঠে না মাদলের দ্রিমিদ্রিমি। পরবে এখন ডিজে বাজে। একদা বিখ্যাত মঞ্চগুলোর বেশিরভাগটাই আজ আর ব্যবহারের উপযোগী নয়। কেন? এই উত্তরগুলোই খোঁজার চেষ্টা করব।

আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতঃ ২০০০ সাল থেকেই প্রায় উত্তরবঙ্গের সর্বত্র একের পর এক চা বাগান বন্ধ হচ্ছে, রুগ্ন হচ্ছে বা হস্তান্তর হয়ে চলেছে। কখনও খুললেও চলছে ধুঁকতে ধুঁকতে। ডানকান, গুডরিক-এর মতো বড় চা নির্মাতাদের উর্দ্ধমুখী মুনাফা সত্ত্বেও উৎপাদন স্থিতিশীল রাখার ও বৃদ্ধি করার জন্য এবং শ্রমিক কল্যাণের জন্য পুঁজির বিনিয়োগ বৃদ্ধি করার অনীহা; ফড়ে, ব্যাপারি ও মধ্যস্বত্ত্ব ভোগীদের হাতে চলে যাওয়া অধিকাংশ বাগানে শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরি পি এফ ইত্যাদির ক্ষেত্রে সীমাহীন বঞ্চনা, দায়হীন নির্বাধ লুঠ, বাগান থেকে মুনাফা তুলে ফাটকাবাজি ইত্যাদি নানা কারণ এর জন্য দায়ী (groundxero.in,2018)। অনেক বন্ধ বাগানে শ্রমিক বা সেলফ হেল্প গ্রুপ খুলে পাতা তুলে বিক্রি করে সংসার চালাচ্ছেন। চলছে আন্দোলন ও ত্রিপাক্ষিক বৈঠকও। তবু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্রমিকদের দুর্দশা অন্তহীন। উৎপাদনের প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া যতদিন চালু থাকে বা স্বাভাবিক নিয়মে পাতা আসে, বাগান চালু থাকে ততদিন। বাকি সময় প্রচুর শ্রমিক চলে যান জন খাটতে ভিন রাজ্যে। শ্রমিকদের আবাস, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বাচ্চাদের পুষ্টি, শিক্ষা সবই অতলান্তিক অন্ধকারে নিমজ্জিত। এই অন্ধকারকে গাঢ়তর করে তুলেছে নারীপাচার-এর পাপ (FII2018)। শ্রমিদের সীমাহীন দুর্দশার সুযোগ নিয়ে নানা আড়কাঠিদের মদতে উত্তরের এই বাগানগুলো হয়ে পড়েছে 'মানুষ বিক্রি'র বড় বাজার। এই পরিস্থিতিতে তাদের সংস্কৃতি অবশ্যই প্রগতি বিমুখ হবে। তাছাড়া বাগানবাবু শ্রেণী যাঁরা বাগান নাটকের চালিকা শক্তি ছিলেন তাঁরা বেশিরভাগই বাগান ছেড়ে খুঁজে নিয়েছেন অন্য চাকরি বা অনেকেই থাকছেন পাশের কোনও শহরাঞ্চলে, সেখানে নিয়েছেন বাগানের চাকরির পাশাপাশি অন্য কোনও জীবিকা। স্বভাবতই সংস্কৃতি চর্চার পথ যে রুদ্ধ হয়ে যাবে তা বলাই বাহুল্য।

রাজনৈতিক বাতাবরণ ঃ উত্তরবঙ্গের চা-বলয়ে বিগত তিন

দশক ধরে বাম শ্রমিক সংগঠনগুলির রাশ আলগা হতে থাকায় সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল চূড়ান্ত অবক্ষয়ের পথে এবং বিশেষ করে সেখানকার যুবকরা অসামাজিক কাজকর্মে লিপ্ত, যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে আদিবাসীর নিজস্ব ধর্মাচরণ নিজস্ব সংস্কৃতি যেন একটু একটু করে ঢাকা পড়ে যায় গৈরিক মেঘের আড়ালে। 'করম' পূজার প্রাণবন্ততাকে যেন চাপা দিয়ে দেয় হনুমান জয়ন্তী রামনবমীর জৌলুশ। ডেঙ্গুয়াঝার চা বাগানের জন ওঁরাও (জলপাইগুড়ি জেলা কোর্টের করণিক, চা শ্রমিকের সন্তান) ও কবিতা ওঁরাও-এর সাথে কথা হচ্ছিল। জন ধর্মে খ্রিস্টান ও কবিতা সারি ধর্ম পালন করেন। তাঁদের সন্তান চার বছরের সুরজকে এখনও কোনও ধর্মের দীক্ষা দেন নি। এ যাবত তাঁদের জীবন ধারণে কোনও অসুবিধা হয় নি। কিন্তু বিগত দু-এক বছর হনুমান জয়ন্তীতে অংশ নেওয়া, রাম নবমীর মিছিলে যাওয়া ইত্যাদি নিয়ে নানারকম চাপ-এর সম্মুখীন তাঁরা হচ্ছেন। এক বিরাট হনুমান মন্দির তৈরি হয়েছে সেখানে, প্রতিদিন ঘটা করে মাইক্রোফোনে পাঠ হয় 'হনুমান চলিশা'। সন্ধ্যায় সেখানে যাওয়া প্রায় অভ্যাস করে ফেলেছেন বাগানের আদিবাসী সমাজ। বন্ধ হয়ে গেছে ওয়ার্কার্স রিক্রিয়েশন ক্লাব-এর বাচ্চাদের কবিতা ও গান শেখার ক্লাস। পাঠাগারের বইগুলো পোকা খেয়ে ফেলেছে। এ শুধু ডেঙ্গুয়াঝারের ছবি নয়। সমগ্র বাগান অঞ্চলেই এই অবক্ষয় বড় প্রকট।

সামাজিক-সাংস্কৃতিকঃ ৯০-এর দশকের পর থেকেই বিশ্বায়নের হাওয়া একটু একটু করে এলোমেলো করে দিয়েছে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিকে। একটু দেরিতে হলেও উত্তরবঙ্গও সেই হাওয়ায় নিজের সংস্কৃতির শুদ্ধতাকে ধরে রাখতে পারছে না। তাই ভাওয়াইয়াতে এখন বাজে সিন্থেসাইজার। মেচেনি নাচের ছন্দে দেখা যায় বলিউডি ঠমক। চা বলয়ে এই বাজারি সংস্কৃতির বিষবাষ্প মূলত ঘিরে ফেলেছে তরুণ প্রজন্মকে। মোবাইল অবশ্যই সবচেয়ে বড় অনুঘটক। মোবাইলে বুদ তরুণ প্রজন্ম টিকটক ও ইউটিউবকেই করে নিয়েছে তাদের বিনোদনের একমাত্র মাধ্যম। তাছাড়া অভাব কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা বাড়িয়ে দিচ্ছে স্কুল ছুটের সংখ্যা। বেশিরভাগ তরুণই কাজের খোঁজে পাড়ি দিচ্ছে শহরে বা ভিন রাজ্যে। পড়ে রয়েছে যারা তাদের মধ্যে ভয়ঙ্করভাবে দেখা দিচ্ছে নেশায় আসক্তি। নেশার তাড়নায় জড়িয়ে পড়ছে নানা অপরাধমূলক কাজে। বন্ধ কালচিনি বাগানের প্রৌঢ়া ফুলমণি কুজুর জানিয়েছেন তাঁর ক্লাস এইটের নাতিকে নেশামুক্তি কেন্দ্রে ভর্তি করতে হয়েছে। তিনি কাজি মানগোলের নাচের দলে নিয়মিত নাচতেন। তাঁর স্মৃতিতে এখনও ধরা রয়েছে কালচিনি বাগানের উজ্জ্বল সাংস্কৃতিক পরিবেশ। কিভাবে পালটে গেল এই পরিবেশ, তিনি তাঁর জীবন্ত সাক্ষী। এখন বন্ধ বাগানে তাঁরা অস্তিত্বের লড়াই করছেন, এ লড়াইয়ে সংস্কৃতি তাঁদের পাশে নেই।

শেষ কথা ঃ উত্তরের চা বলয়ের ভেঙে পড়া আর্থসামাজিক পরিকাঠামো, পরিবর্তিত রাজনৈতিক বিন্যাস ও সেই সাথে বাজারি সাংস্কৃতিক দাপট তাঁদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছে। নাট্যচর্চার উজ্জ্বল ইতিহাস আজ উত্তরাধিকারশূন্য। নেশাসক্তি, উচ্ছৃঙ্খলতা, অপুষ্টি, অশিক্ষা তাঁদের ঘটমান বর্তমান। এই বর্তমান, সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চার পরিপন্থী এবং সুস্থ সংস্কৃতির অভাবেই তৈরি হয়েছে বাগানের তরুণ প্রজন্মের এই জীবনচর্যা— যেন এক দুষ্ট চক্র। যদিও অন্ধকারময় এই সময়ে কিছু রুপোলি রেখা আমরা দেখেছি মালবাজার, ডামডিম, ডেঙ্গুয়াঝার, গয়েরকাটা, চালসায়। সেখানে এখনও কিছু মানুষ নাট্যচর্চা বজায় রেখেছেন মনের তাড়নায়। ডামডিমে শ্রমিক পরিবারের কচিকাঁচারা শিখছে নাটক আবৃত্তি ছবি। ডেঙ্গুয়াঝারে একদল আদিবাসী ছেলে গড়েছে গানের দল, তাঁরা ওঁরাও গান করে এবং নানা জায়গায় অনুষ্ঠান করে রোজগারও করে। কিছু বাগানে আছে পেশাদার আদিবাসী নাচের দল যারা নানা সরকারি বেসরকারি উৎসবে নৃত্য পরিবেশন করে থাকে। তবে এই ধরনের ফরমায়েশি নৃত্য চর্চায় প্রাণের আরাম বা মাটির গন্ধ কমই থাকে। সামগ্রিকভাবে বাগান অঞ্চলের সংস্কৃতির ছবিটা বেদনার। অর্থনীতির উন্নয়নের সাথে সাথে হয়ত ছবিটা পাল্টাবে। সেই সঙ্গে মধ্যবিত্ত বাঙালি শ্রেণী যাঁরা বাগানের সংস্কৃতি চর্চাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন এক সময়, তাঁরা যদি আবার এগিয়ে আসেন আদিবাসী তরুণ প্রজন্মকে দিতে পারেন উপযুক্ত পথনির্দেশ বা নিজস্ব শিকড়ের সন্ধান, তাহলে হয়ত আপাত রুদ্ধ চাকাটা আবার ঘুরতে পারে।

যাঁদের সাহায্য ছাড়া এ লেখা সম্ভব হত না — জন ওঁরাও (ডেঙ্গুয়াঝার), দিলীপ ঘোষ (বানারহাট), ব্রজদুলাল বসু (গয়েরকাটা), কানাই চট্টোপাধ্যায় (ঐ), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (কালচিনি), ফুলমণি কুজুর (কালচিনি)

তথ্যসূত্র: ১. সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রেক্ষিতে বিন্নাগুড়ি। ভরতচন্দ্র বড়ুয়া। ২০০৭ (কাশফুল। ৭২তম সর্বজনীন দুর্গাপূজা, বিন্নাগুড়ি), ২.groundxero.in (2018): চা বাগান ও চা শিল্পের তথাকথিত রুগ্নতা ও শ্রমিক আন্দোলনের প্রসঙ্গে সৌমিত্র ঘোষ (আগস্ট ১০,২০১৮)

৩. Feminism in India (2018): Tea Gardens of North Bengal: A hotbed of Human Trafficking. Alantika Anand, Aug.1, 2018.

উমা

‘‘মানুষ মানুষকে পণ্য করে, মানুষ মানুষকে জীবিকা করে...’’

গৌতম মিস্ত্রী

মানুষ মানুষকে পণ্য করে এসেছে যবে থেকে মানুষ সভ্য হয়েছে। মানব সভ্যতার দাম বলা যেতে পারে একে। পৃথিবীতে জীব বিবর্তনের ফলে ঘটনাচক্রে আধুনিক মানুষের উদ্ভব হবার প্রায় ২০ থেকে ২৫ লক্ষ বৎসর পরে মানুষ মনে করে তারা এখন সভ্য হয়েছে। আধুনিক মানুষের, মানে একদম আমাদের মতোই শরীর ও জৈবিক ক্রিয়ার মতো মানুষ বিবর্তিত হয়েছিল পূর্ব অথবা উত্তর আফ্রিকায় প্রায় ২৫ লক্ষ বৎসর আগে। আধুনিক মানুষের বিবর্তনের অনেক অনেক যুগ পরে এক মানুষ আরেক মানুষকে কেনা-বেচা অথবা শিকল পরানো, কুকুরেরও অধম, দাসে পরিণত করতে শুরু করে মাত্র সাত-আট শতাব্দী আগে। *“আলু বেচো, ছোলা বেচো, বেচো বাখর খানি/বেচো না বেচো না বন্ধু তোমার চোখের মণি।/কলা বেচো, কয়লা বেচো, বেচো মটরদানা/বুকের জ্বালা বুকেই জ্বলুক, কান্না বেচো না।/ঝিঙে বেচো পাঁচ সিকেতে, হাজার টাকায় সোনা/বন্ধু তোমার লাল টুকটুকে স্বপ্ন বেচো না।/ঘরদোর বেচো ইচ্ছে হলে, করব নাকো মানা/হাতের কলম জনম দুখী, তাকে বেচোনা।’’*

[কথা ঃ সমীর রায়। সুর ও কণ্ঠ ঃ প্রতুল মুখোপাধ্যায়।]

মানুষের পণ্যায়ন ক্রমশ বাড়ছে। আপনি, আমি ...সবাই এই কর্পোরেট দুনিয়ায় পণ্য, অর্থাৎ বিক্রয়যোগ্য। বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতায় সুন্দর মুখ আর আকর্ষণীয় দেহের মানুষরা পণ্য, ক্রিকেট খেলার ব্যাটবলের মারকাটারিতে জেতা খেলোয়াড়রা পণ্য। এমনকি ডায়াবেটিসে আক্রান্ত, কিন্তু সিনেমায় খ্যাতনামা অভিনেতাও পণ্য, যিনি তাঁর কোষ্ঠকাঠিন্যের সমাধান স্বরূপ লিভারের কর্মক্ষমতার উন্নতিকল্পে যে লিভার টনিকের বিজ্ঞাপন দিয়ে গেছেন, সেটা অকাজের হলেও অভিনেতার মুখের একটি ‘কোষ্ঠকাঠিন্য মুক্ত (!)’ সহাস্য ছবি একটি সফল পণ্য। তাইতো লিভারের টনিকের বিক্রিবাটা সেই অভিনেতার সারা জীবনের খাটুনির পারিশ্রমিকের চেয়ে অনেকগুণ বেশি। পুঁজিবাদী এই পণ্যের বিক্রিবাটা সম্বন্ধে আমরা অনেকেই ওয়াকিবহাল। কিন্তু মানুষের শরীর আর মন পণ্য হলেও তাঁর রোগ ব্যাধিও যে পণ্য হতে পারে সেটাও আমরা কিছুটা দেখেছি ইদানীংকালে। সবটা দেখি নি।

কাঙ্ক্ষিত সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা পরিষেবার (ইউনিভার্সাল হেল্‌থ কেয়ার) অধিকারের বদলে যেদিন আমরা মেনে নিলাম কর্পোরেট হাসপাতাল, স্বাস্থ্য বীমা আর ক্রেতা সুরক্ষার আইনের আওতায় চিকিৎসা পরিষেবায় অন্তর্ভুক্তি, সেদিন আমাদের অগোচরেই রোগ একটা পণ্যে পরিণত হল। আমরা সচেতনে অথবা অবচেতনে রোগ ও রুগীর সেই ভোল বদল মেনে নিলাম।

গত তিন দশকে স্বাস্থ্যরক্ষার কর্মকাণ্ড সরকারি আবশ্যিক দায় থেকে উৎখাত হয়ে পাকাপাকিভাবে চিকিৎসা সওদাগরের পসরায় ক্রয়যোগ্য পণ্যে পরিণত হল। বেশিদিন নয়, গত শতকের আশির দশকেও সর্বোত্তম চিকিৎসার জন্য ধনী-গরীব সব মানুষের শেষ ভরসাস্থল ছিল সরকারি হাসপাতাল। সেই সময় অবশ্য ছোটখাটো, খুচরো শারীরিক সমস্যার সমাধানের জন্য হাতে গোনা কয়েকটি বেসরকারি বিলাসবহুল হাসপাতাল ছিল, বিলাসপ্রিয় খ্যাতনামা মানুষদের সর্দিকাশির মতো মামুলি রোগের চিকিৎসার জন্য। মানুষের রোগ তখনও এমন করে পণ্যায়িত হয় নি, যেমনটা এখন হয়েছে। ইঙ্গিত এটাই, আগামী দিনগুলোতে আমাদের চারপাশের প্রিয় মানুষদের রোগভোগের চিকিৎসা পরিষেবা আরও বেআব্রুভাবে কর্পোরেট স্বাস্থ্য ব্যবসার পণ্যে পরিণত হবে। এর প্রতিরোধে বিকল্প কিছুই কী করা যাবে না? মানুষ আদতে বুদ্ধিমান। তাই মানুষ আর এক মানুষে ভরসা রাখছিল। ভবিষ্যতেও সমস্যায় পড়া মানুষের, পড়শি মানুষে ভরসা রাখার জন্য আমাদের চিন্তা ভাবনার বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করা দরকার। কিন্তু সেই চেষ্টা অন্যে করে দেবে ভাবলে, দেখা যেতেই পারে, দুধের বদলে সবাই কেবল জলই ঢালছে দুধ-পুকুরে।

পণ্য হিসাবে রোগভোগ সংক্রান্ত তথ্যের এই নব অবতারের কথা নতুন করে উল্লেখ করার অপেক্ষা রাখে। পুঁজিবাদী ও ভোগবাদী নির্ভর বর্তমান সামাজিক কাঠামোয় ক্রমবর্ধমান বাজারের প্রয়োজন। চিকিৎসা পরিষেবাও একটা আশাপ্রদ পণ্য। তারও বাজার দরকার বাজারে টিকে থাকার জন্য। আমাদের দেশে বেসরকারি ও সোজাসাপ্টা খুল্লম-খুল্লা

দেশ আমেরিকায় সরকারি চিকিৎসা পরিষেবায় ব্যবসায় অস্তিত্ব মোটেই প্রচ্ছন্ন নয়। বরং সেটা বুক বাজিয়ে বলার স্পর্ধা রাখে চিকিৎসা ব্যবসায়ীরা। যেমন এখন কলকাতা শহরের রাস্তার পাশে বিলবোর্ডের বিজ্ঞাপন—'মাঝরাতে বুকে ব্যথা? হার্টের রোগ হতে পারে। আমাদের হাসপাতালে আমরা দিবারাত্র জেগে বসে আছি।' অ্যাপ্রন পরা ডাক্তারের মতো দেখতে নয়, বরং সিনেমার হিরো মতো দেখতে আর গলায় স্টেথোস্কোপ ঝোলানো ডাক্তারের ভূমিকায় পোজ দেওয়া মডেল ডাক্তারের স্থির ও চলমান ছবি আমার আপনার মোবাইল ফোনের ভার্চুয়াল মাধ্যম অধিকার করে আছে। 'বসে আছি আপনার বুকের ব্যথার অপেক্ষায়,' —এ কেবল বিজ্ঞাপনের বাণী নয়, বিনা কারণে ভয় দেখানো। কিন্তু সাতেও নেই আবার পাঁচেও নেই সেই হরিপদও বুঝে যায়, হরিপদর বুকে ব্যথা হলে সে বাঁচল না মরল সেটা কেবল তাঁর পরিবারের ব্যক্তিগত বিষয়। আসল বিষয় হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবসায়ের লাভ-লোকসান। আমি এখন ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত মানুষের বিকল্পহীন ও আবশ্যিক ক্রয়যোগ্য চিকিৎসা ব্যবসার পণ্যায়নের একটা নতুন উৎপাতের কথা বলতে চলেছি, যেটার কথা আমরা অনেকেই জানি না। আমি দুটো সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার কথা বলে শুরু করছি।

ঘটনা ১ — বছর চল্লিশের এক ভদ্রমহিলা, আমার পরামর্শমতো রক্তচাপ কমানোর ওষুধ অনেক বছর ধরে খাচ্ছিলেন। ভালোই ছিলেন। মাস ছয়েক পরে পরে আমার কাছে আসতেন আশ্বাসবাণী শোনার জন্য আর চিকিৎসা নিদানপত্র নবীকরণের জন্য। গত মাসে তিনি এসেছিলেন। এবার তাঁর ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত। সরাসরি আমাকে হুমকি দিলেন, 'আমার যে প্রেশারের রোগ আছে, এমনকী আমি যে ওষুধ খাই, সেই খবর আমি গোপনীয় বলে মনে করি। সেই একান্ত ব্যক্তিগত মানে স্পর্শকাতর খবর তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকে জানিয়ে, আমাকে বেআব্রু করে আপনার কী লাভ?' আমি বেকায়দায় পড়ে কবুল করলাম, 'মহাশয়া, নীতিগত কারণে আপনার অনুপস্থিতিতে আপনার বাড়ির লোক এলেও আমার অফিস থেকে রোগীর কোনো প্রকারের তথ্য আমরা টাকার বিনিময়ে কাউকে শেয়ার করি না। এটা চিকিৎসকদের একটা অবশ্য পালনীয় কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। আপনি প্রথমে নিশ্চিন্ত হোন, আপনার ঠিকানা, ফোন নম্বর, রোগের হালহকিকত আর আপনার ওষুধের লিস্ট আমার ক্লিনিক থেকে লিক হয় নি। আমরা রোগীর চিকিৎসায় যে পারিশ্রমিক পাই তাতেই তৃপ্ত, আমাদের রোগীর ঠিকানা আর রোগের তথ্য বিক্রি করতে হয় না। সেই অনৈতিক তথ্য বিক্রির প্রয়োজন আমরা উপলব্ধি করি না। আপনি আমার ক্লিনিক থেকে যে কম্পিউটারাইজড প্রেসক্রিপশনের প্রিন্টআউট পান পুরো ব্যাপারটা আপনার সামনে আমিই করি আমার কম্পিউটারে। সেখানে তৃতীয় কোনো ব্যক্তি থাকে না। সেই ব্যবস্থাটা অফলাইন, মানে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েভে, আমার অনুমতি ছাড়া সারা বিশ্বে নাঙ্গা হবার কোনো উপায় নেই। আপনাকে একটা অনেকের না জানা তথ্যও জানাই, ভারতে কম্পিউটারাইজড প্রেসক্রিপশনের ৯৫% কিন্তু অনলাইন, মানে নাঙ্গা (কে দেখবে বা কে ব্যবহার করবে সেটা উহ্য)। আমার চিকিৎসার ডিজিটাল অবতারে অনলাইন উপদ্রব নেই।'

এই ব্যবস্থার বিপরীতে, মানে অনলাইন ব্যবস্থায়, রুগীর স্পর্শকাতর তথ্য রুগীর আস্থাভাজন চিকিৎসকের কাছে থাকেই না— সেটা অনলাইন কম্পিউটারাইজড প্রেসক্রিপশন তৈরি করার পরিষেবা প্রদানকারী আইটি কোম্পানির সার্ভারে থাকে। এটা কেবল অনুমান নয়, এটাই বাস্তব, সেই তথ্য অসংখ্য আর বিভিন্ন ধান্দার বেনিয়াদের কাছেও পৌঁছে যাবার একটা নতুন ব্যবসা আমাদের দেশে চালু হয়ে গেছে।

আগে অনুমান করলেও সেদিন বুঝলাম, চিকিৎসক না চাইলে, রোগীও না চাইলে রোগীর রোগের তথ্যের খবর (মানে রোগীর কী রোগ, তাঁর নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর, তিনি কী ওষুধ খাচ্ছেন ইত্যাদি) পুরো মাত্রায় একটি নতুন ব্যবসার আশাব্যঞ্জক ব্যবসার কাঁচামাল। চিকিৎসক হিসাবে কোনো রোগীকে আমি হয়ত একটা সস্তার ও কাজের ওষুধের নিদান দিলাম। সেই সস্তার ওষুধ রোগীর পরিচিত ওষুধের দোকানদার অনেক সময় মাসকাবারি হিসাবে ধারবাকিতেও রোগীকে বিক্রি করে থাকেন। রোগী একটা ধন্দে পড়েন যখন ভরসার চিকিৎসকের আর ধারবাকিতে দেন, এমন পাড়ার ওষুধের দোকানির মধ্যে মত পার্থক্য হয়। ওষুধ বিক্রি করার দোকানদারের পরামর্শে রোগী ডাক্তারের নিদানের বিকল্প ওষুধ খাবেন কিনা এই সংশয়ের বীজ রোগীকে ধন্দে ফেলে। চিকিৎসকও এই সমাজে বাস করেন। একই ওষুধ, একাধিক কোম্পানির মধ্য থেকে তাঁকে বেছে নিয়ে রুগীকে নিদান দিতে হয়। সেখানে বিশেষ কোনো এক ওষুধ নির্মাতা কোম্পানি, যে চিকিৎসককে হয়ত একটা কলম, একটা চিকিৎসকদের সম্মেলনের চাঁদা, নতুন বছরের একটা টেবিল ক্যালেন্ডার অথবা ওষুধের নাম লেখা একটা পেপার ওয়েট উপহার দিয়েছে। সব চিকিৎসকদের পক্ষে এই ঘুষ প্রত্যাখ্যান করা, ঘুষে প্রভাবিত না হওয়া মুস্কিল। এটা পাগলেও বোঝে। ঘটনা

এই যে, ভারতবর্ষের বর্তমান ভোগবাদী সংস্করণে চিকিৎসক-রোগীর এই কেমিস্ট্রিতে ওষুধ বেনিয়ার ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি হয়, রোগীর কিছু প্রাপ্তি হয় কিনা সে একটা বড় প্রশ্ন। বেচারা চিকিৎসকরা নতুন করে স্বাস্থ্য রক্ষার বা মেরামতের পরিষেবার বাজারে টিকে থাকার অজানা রহস্য জেনে হতাশ হন।

যতক্ষণ পর্যন্ত না সমাজ সাবালক হচ্ছে, চিকিৎসকের রোগের নাম উল্লেখ না করা বাঞ্ছনীয় বলে আমি মনে করি। সাথে একটা আলাদা নথিতে সেটা উল্লেখ করে দিলে সেটা উপযুক্ত স্থানে (অন্য চিকিৎসকের কাছে, ল্যাবরেটরিতে) রুগী দেখাবেন। ওষুধের দোকানে সেটা দেখানোর প্রয়োজন নেই। আজকাল আবার অনলাইন ওষুধের বিক্রির ব্যবস্থা হয়েছে। মনে রাখতে হবে অনলাইন ওষুধের পোর্টাল অথবা পাড়ার ওষুধের দোকানে আপনার ও আপনার রোগের নাম, ওষুধের নাম, আপনার ঠিকানা আর ফোন নম্বর নথিবদ্ধ হওয়া শুরু হয়ে গেছে। শুরু হয়ে গেছে অনলাইন (ক্লাউড কম্পিউটিং-এর) পরিষেবা নিয়ে প্রেসক্রিপশন করার চল নতুন জমানার ডাক্তারদের মধ্যে। একটা সমীক্ষা অনুযায়ী ইদানীংকালে ৯৫% কম্পিউটারাইজড প্রেসক্রিপশন ক্লাউড কম্পিউটিং পরিষেবা ব্যবহার করে তৈরি হয়। রোগ আর রোগীর গুরুত্বপূর্ণ নথি চিকিৎসকের কাছে জমা থাকে না, জমা থাকে ক্লাউড কম্পিউটিং পরিষেবা প্রদানকারী একটি আইটি সেক্টরের কোম্পানির কাছে। যদিও ক্লাউড কম্পিউটিং পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা এই আশ্বাস দেয়, তাদের সার্ভারের ডাটাবেস অত্যন্ত সুরক্ষিত— চিকিৎসক, রোগী, রোগ আর ওষুধের বিক্রয়যোগ্য নথি তাঁরা অনৈতিকভাবে বেচবে না। তবুও সঙ্গত কারণে ভারতের মতো আধা সভ্য দেশে রুগীর বেআব্রু হওয়ার উদ্বেগ প্রাসঙ্গিক। অপেক্ষাকৃত সভ্য পশ্চিমী দেশে অনলাইন চিকিৎসা সংক্রান্ত নথি সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে— তবে সেটার মালিক বেনিয়া আইটি সেক্টরের কোম্পানি নয়, সেটার পূর্ণ দেখভাল করে সরকারি অথবা ভরসাযোগ্য বেসরকারি সংস্থা। সেই রকম ইলেক্ট্রনিক তথ্য সংরক্ষণ ও তার ব্যবহারে স্বচ্ছন্দ চিকিৎসক ও অন্যান্য চিকিৎসা কর্মীর বড় অভাব ভারতবর্ষে।

ঘটনা ২ — ডায়াবেটিসে আক্রান্ত মফস্বলের এক পুরনো রুগী, বিগত দশ বছর ধরে বছরে দুই-একবার চিকিৎসা-নিদান নবীকরণের জন্য আসেন। যখন অনিবার্য হয়ে পড়ল, মাঝবয়সের যথেষ্ট সচেতন ভদ্রমহিলা নিদান মতো তিনি ইনসুলিন ইনজেকশন ব্যবহার করতে দ্বিধা করেন নি। বেশ ভালোই আছেন তিনি। মাস ছয়েক পর এসে একটা ভ্রূকুটি হেনে বললেন — 'আপনি আমাকে টক দই আর বিস্কুট খেতে বারণ করেছেন, অথচ আপনি যে কোম্পানির ইনসুলিন নিতে বলেছেন, সেই ইনসুলিন কোম্পানির এক অতি স্মার্ট খাদ্য বিশারদ (ডায়াটিশিয়ান) আমাকে ফোন করে আমার সুবিধামতো সময় জেনে আমার বাড়িতে এলেন। তিনি দৈনিক ওটমিল, টক দই, দুটো করে বেশ দামি একটি বিশেষ কোম্পানির প্রোটিন সমৃদ্ধ বিস্কুট আর দৈনিক চারটে করে আমন্ড খেতে পরামর্শ দিলেন। সেই বিস্কুট আবার বাজারে পাওয়া যায় না। উনি সেই বিস্কুট সরাসরি আমার বাড়িতে পাঠাবেন।' হতবাক আমি একটা তুচ্ছ প্রশ্ন করলাম, 'চারটের জায়গায় পাঁচটা আমন্ড খেলে কী হবে? রুগী সেই গুরুগম্ভীর প্রশ্ন তরুণী খাদ্য বিশারদকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন নি। প্রসঙ্গ পাল্টে রুগী বললেন, 'সবার শেষে একটি বিশেষ প্রোটিন পাউডারের প্যাকেট খাবার নিদান দিয়েছেন, সেটা নাকি বলিউডের নায়ক-নায়িকাদের সুতনুর গোপন রহস্য। সেটাও বাজারে মিলবে না। এই প্রোটিন পাউডারের প্যাকেটটাই বেশ কাজের বলে আমার রুগীর মনে হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাওয়া জ্ঞানে প্রোটিন যে স্বাস্থ্যের জন্য ভাল খাবার সেটা আবছাভাবে সবারই মনের দুর্বল জায়গায় সুড়সুড়ি দেয়। রুগী আরও বললেন, 'সেই প্রোটিন-পোরা পাউডারের প্যাকেটও ডায়াটিশিয়ান দিদিমণি আমাকে সাপ্লাই করতে পারবেন।' রোগীর প্রাক্তন চিকিৎসক হিসাবে আমি ভাবলাম আমার পসার অধঃপাতে গেল।

আমি এবং আপনি চুনোপুঁটি। খাবার নির্বাচনের সমস্যা কেবল স্বচ্ছল মানুষের। অস্বচ্ছল মানুষের আর গরু-ছাগলের এই সমস্যা নেই। গরু-ছাগলদের কেবল খাবার ঘাসওয়ালা জমি খুঁজে নিতে হয়। অস্বচ্ছল মানুষের ভাল-খারাপ খাবার নির্বাচনের প্রয়োজন নেই। তাঁর সামনে একাধিক রকমের খাবারের থালাই নেই।

স্বচ্ছল কিন্তু স্বাস্থ্য সচেতন নন অথবা সচেতন, কিন্তু ভাল খাবার কোনগুলি সেটা জানা নেই এমন মানুষের তাই খাদ্য-বিশারদ বা ডায়াটিশিয়ান নামের কিছু মানুষের পরামর্শ ক্রয় করতে হয়। এইভাবে খাদ্য-বিশারদ নামের একটা পেশা তৈরি হয়ে গেল। সেই পেশাধারীর অনেকেই (সবাই নন) বাজারে পাওয়া যায় না এমন সব প্রোটিন-সমৃদ্ধ প্রক্রিয়াজাত পাউডার, চকোলেট সরাসরি বিক্রিবাটা করেন অথবা সেই পণ্য বিক্রির দালালি করেন। এইভাবে বহুজাতিক বেনিয়াদের কাছে খাদ্য-বিশারদ নামের এক পেশাধারীদের মেলবন্ধন তৈরি

হয়ে গেল। হরলিক্স, এনশিওর, কমপ্লান ইত্যাদি তথাকথিত অকাজের ও অস্বাস্থ্যকর বিষ-খাদ্যের উপভোক্তার বাজারকে নিশানা করে রেডিও, টেলিভিশন, ফেসবুক, ইন্সট্রাগ্রাম, খবরের কাগজ আর রাস্তার বিলবোর্ডে বিজ্ঞাপনের দখল বেনিয়াদের হাতে চলে গেল। এই বেনিয়াদের কাছে রুগীর তথ্যভাণ্ডার যে লোভনীয় সেটা বোঝার জন্য বেশি বুদ্ধি লাগে না। পরীক্ষা করতে চান? স্মার্ট ফোনে প্রোটিন সমৃদ্ধ প্যাকেটজাত খাদ্যের (যেমন, প্রোটন বার) মাত্র একবার গুগল সার্চ করে দেখুন, আগামীকাল থেকে আপনার ফেসবুকে অসংখ্য প্রোটিন বারের বিজ্ঞাপন আসতে শুরু করবে। আপনি প্রোটিন বার-এর সম্ভাব্য ক্রেতা হিসাবে সারা বিশ্বের প্রোটিন বার নির্মাতা কোম্পানির নিশানায় ধরা পড়ে গেলেন।

রোগীর রোগ এমনভাবে বেআব্রু হয় নি আগে। রোগী কী কী ওষুধ খান, হয়ত সারাজীবন খেয়ে যাবেন, এই তথ্য অনৈতিকভাবে একটা পণ্য হিসাবে বাজারের পণ্যের পসরায় আগে কখনও বিক্রির অপেক্ষায় থাকে নি। এটাকে রুখতে হলে, চিকিৎসকদের উচিত অফলাইন সফটওয়্যার ব্যবহার করা আর রুগীদের উচিত প্রেসক্রিপশনের অংশ ওষুধের দোকানে দেখানো অথবা অনলাইন ওষুধ কেনার সাইটে আপলোড করা। তাতে টিভিতে হরলিক্সের বিজ্ঞাপন হয়ত বন্ধ হবে না, কেবল রোগের ও রুগীর পণ্য হবার নগ্ন ও ঘৃণ্য ব্যবসার পণ্য হওয়া থেকে আপনি, আপনার পরিবার, আপনার আত্মীয় পরিজন আর আমি আপাতত অব্যাহতি পাব। উমা

বিকল্প চিকিৎসার পুনরুত্থান ও হোমিওপ্যাথি গবেষণার নতুন অভিমুখ

সুব্রত রায়

তৃতীয় পর্ব

ক্লিনিক্যাল পরীক্ষানিরীক্ষায় হোমিওপাথি

(১) ডাবল-ব্লাইন্ড ট্রায়াল—ওষুধের কার্যকারিতা যাচাইয়ের আধুনিক পরীক্ষার ব্যাপারে অনেক হোমিওপ্যাথই আপত্তি জানান— এ ব্যাপারে বঙ্গীয় এক হোমিওপ্যাথের মতামত শোনা যাক, ইতিপূর্বের উদ্ধৃতিগুলোর সাপেক্ষে কিঞ্চিৎ খাপছাড়া হলেও। 'হোমিওপ্যাথি ও আধুনিক বিজ্ঞান' পুস্তকে পরমেশ বসু লিখেছেন— হোমিওপ্যাথিতে অবিশ্বাসী ব্যক্তিরা ইদানিং [sic.] শোরগোল তুলেছেন এই বলে যে, শয্যাপার্শ্বিক (ক্লিনিক্যাল) পরীক্ষা দ্বারা হোমিওপ্যাথিক ওষুধের প্রামাণিকতা প্রমাণ করা হোক। কারণ, এটা তাঁরা বিলক্ষণ জানেন যে, হোমিওপ্যাথিক ওষুধ এভাবে পরীক্ষা করা প্রায় অসম্ভব এবং অবাস্তবও (বসু ১৯৯৪:২৩)।

তাঁর আপত্তিটি হল, হোমিওপ্যাথিতে কোনও বিশেষ রোগের নয়, 'লক্ষণসমগ্র' বিচার করে সমগ্র মানুষটির চিকিৎসা করা হয় বলে ক্লিনিক্যাল পরীক্ষার উপযোগী রোগীদের দল গঠন করা কঠিন। কূটতর্কে না গিয়ে এ ব্যাপারে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, হোমিওপ্যাথির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে হোমিওপ্যাথরাই এই উদ্বেগজনক সমস্যার সমাধান করেছেন এবং চারদিকে প্রচুর ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা হচ্ছে। এবং এ কথাটি অনেকেরই অজানা যে, নিয়ন্ত্রকের বিপরীতে ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা সংঘটিত করার ব্যাপারে জেমস্ লিন্ড উদ্ভাবিত পদ্ধতিকে হোমিওপ্যাথির ক্ষেত্রেই প্রথম কাজে লাগানো হয়। ১৮৩৫ সালে সাবেক জার্মানির ন্যুরেমবার্গ শহরে একদল 'সত্যপ্রেমী' মানুষের উদ্যোগে *natrum muriaticum 30C* (সাধারণ খাবার লবণের হোমিওপ্যাথিক মাত্রা) নিয়ে ডাবল-ব্লাইন্ড পরীক্ষাটি সংঘটিত হয়। এরও কয়েক বছর আগে রাশিয়ায় তালজিন ও সেন্ট পিটার্সবার্গ শহরেও হোমিওপ্যাথি নিয়ে প্লাসিবো নিয়ন্ত্রিত ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল করা হয়েছিল, কিন্তু সেগুলি ডাবল-ব্লাইন্ড পরীক্ষা ছিল না (Dean 2006)। পরীক্ষাগুলির পদ্ধতিগত মান ভালো না হওয়ায় এ থেকে বেরিয়ে আসা ফলাফল নিয়ে মন্তব্য করা কঠিন এবং তা আজকের দিনে প্রাসঙ্গিকতাও হারিয়েছে। হোমিওপ্যাথি নিয়ে এ পর্যন্ত বহু সংখ্যক *আরসিটি* বা 'জোড়া অন্ধের পরীক্ষা' হয়েছে। নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞরা যেমন করেছেন, তেমনি হোমিওপ্যাথরাও করেছেন। কিন্তু মুশকিল হল, সব পরীক্ষানিরীক্ষার মান সমান নয়। একটি ক্লিনিক্যাল পরীক্ষার গুণমান নানান বিষয়ের উপরে নির্ভর করে—উন্নত ও নিখুঁত ডিজাইন, অধিক সংখ্যায় নমুনা, প্লাসিবোর ব্যবহার, সঠিক ব্লাইন্ডিং, ফলাফল বিশ্লেষণে উপযুক্ত পদ্ধতির প্রয়োগ ইত্যাদি। ১৯৭০-র দশকের পর থেকে বিকল্প চিকিৎসার পালে হাওয়া উঠলে বিকল্প চিকিৎসা বিষয়ে প্রকাশিত জার্নালের সংখ্যাও লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে ওঠে। এই সব জার্নালে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রকাশিত হোমিওপ্যাথির ক্লিনিক্যাল

পরীক্ষানিরীক্ষার মান সংক্রান্ত একটি গবেষণায় মন্তব্য করা হয়েছে যে, গুণমানের দিক থেকে এখনও তা শৈশবাস্থা কাটিয়ে উঠতে পারে নি (Jonas et al 2001)। সুতরাং *আরসিটি*-র ফলাফল দেখে সব সময়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। তাছাড়া, যদিও ওষুধে কার্যকারিতা যাচাইয়ের জন্য বর্তমানে *আরসিটি*-ই সর্বোৎকৃষ্ট উপায়, এরও সীমাবদ্ধতা আছে। কখনও কখনও কোনও পরীক্ষা সম্পূর্ণ ভ্রান্তভাবে ইতিবাচক ফলাফল দিতে পারে। আকাঙ্ক্ষিত যে, ব্যতিক্রমী ফলাফলকে স্বাধীনভাবে অন্য গবেষকরা পুনঃসম্পাদন করে পূর্বের ফলাফল সম্পর্কে নিশ্চিত হবেন। কিন্তু অনেক সময়েই তা ঘটে না (Vickers 1999)। ফলে প্রায়শই একই চিকিৎসাপদ্ধতি বা ওষুধ সম্পর্কে পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়, হোমিওপ্যাথির ক্ষেত্রে বিষয়টি ভীষণভাবে বাস্তব। এর বিপদ হল, সুবিধাজনকভাবে তথ্য খুঁটে নেওয়ার প্রবণতা বেড়ে যায়। হোমিওপ্যাথির পক্ষ ও বিপক্ষ নিজেদের পছন্দমতো গবেষণাকে নিজ নিজ অবস্থানের সমর্থনে পেশ করতে থাকেন। ১৯৯৩ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে সংঘটিত প্রাসঙ্গিক উঁচু মানের গবেষণাগুলি একত্রিত করে ২০১১ সালে পেনিনসুলার মেডিক্যাল স্কুল বিকল্প চিকিৎসার গবেষণা বিষয়ে একটি চমৎকার সামগ্রিক নথি প্রকাশ করে।

(২) সিস্টেম্যাটিক রিভিয়্যু ও মেটা-অ্যানালিসিস — ক্লিনিক্যাল গবেষণা সংক্রান্ত এই সমস্যাকে অতিক্রম করার জন্য একই প্রকার গবেষণা থেকে অনেকগুলির তথ্য নিয়ে তা বিশ্লেষণ করে সিস্টেম্যাটিক রিভিয়্যু বা মেটা-অ্যানালিসিসের সাহায্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। একটি বিশেষ ওষুধ বা চিকিৎসাপদ্ধতি নিয়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানী বা সংস্থার তরফে সংঘটিত অনেকগুলো আলাদা আলাদা পরীক্ষার ফলাফল এক জায়গায় করলে মোদ্দা কথাটা কী বেরিয়ে আসে, সেটা জানার জন্যই এ ধরনের পদক্ষেপ। একটি সিস্টেম্যাটিক রিভিয়্যু-এ কোন গবেষণাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে, তা ঠিক করার জন্য প্রথমেই গুণমান সংক্রান্ত একটি মাপকাঠি স্থির করে নেওয়া হয় এবং সেই অনুযায়ী একই গবেষণাক্ষেত্র সমস্ত গবেষণাকে পূর্বস্থিরীকৃত মাপকাঠির সাহায্যে ছেঁকে নেওয়া হয়। উদ্দেশ্য হল, নির্দিষ্ট গবেষণাক্ষেত্র নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া যেন যথাসম্ভব পক্ষপাত ও ত্রুটিমুক্ত থাকে। এরপর সংগৃহীত যাবতীয় তথ্য বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তথ্য বিশ্লেষণের জন্য বিশেষ সংখ্যাতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া বথ্যবহৃত হলে, তাকে মেটা-অ্যানলিসিস বলে। সিস্টেম্যাটিক রিভিয়্যু-তে মেটা-অ্যানলিসিস প্রক্রিয়া ব্যবহার করলে তা অনেক বেশি যুক্তিগ্রাহ্য ও নৈর্ব্যক্তিক হয়ে ওঠে।

হোমিওপ্যাথি নিয়ে এ পর্যন্ত সংঘটিত সিস্টেম্যাটিক রিভিয়্যু-র সংখ্যা নেহাত কম নয়। ২০১৬ সালের হিসেব থেকে দেখা যাচ্ছে, ওই সময়ে এর সংখ্যা ছিল প্রায় ৫০টি। সব রিভিয়্যুই পদ্ধতিগতভাবে শক্তপোক্ত নয়। ককরেন কোলাবরেশন হল পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে থাকা গবেষকদের একটি প্রতিষ্ঠান, যার কাজ হল পক্ষপাতবিহীন উঁচু মানের সিস্টেম্যাটিক রিভিয়্যু প্রকাশ করে চিকিৎসা বিষয়ক এবং অপেক্ষাকৃত ভালো মানের সাম্প্রতিকতম গবেষণা দিয়ে পুরনো গবেষণাগুলিকে নিয়মিতভাবে প্রতিস্থাপিত করা। সাধারণ বিজ্ঞান-না জানা মানুষও যাতে এর সিদ্ধান্তগুলি বুঝতে পারেন, সেজন্য এতে বিশেষ ব্যবস্থা দেওয়া থাকে।

চিকিৎসা পদ্ধতি হিসাবে সর্বাঙ্গীণ মূল্যায়ন— বিভিন্ন রোগের জন্য এই সমস্ত ফলাফলগুলিকে একত্র করে তা থেকে চিকিৎসা পদ্ধতি হিসাবে গোটা হোমিওপ্যাথির মূল্যায়ন করা যায়। নির্দিষ্ট মানদণ্ডের ভিত্তিতে প্রথমে বিভিন্ন রোগের জন্য আরসিটি সংগ্রহ করে তা থেকে বিভিন্ন রোগের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তারপর ওই সিদ্ধান্তগুলি একত্রিত করে গোটা পদ্ধতির মূল্যায়ন করা হয়। এ ব্যাপারে প্রথম উল্লেখযোগ্য কাজটি প্রকাশিত হয় ১৯৯১ সালে। ক্লেইজনেন ও তাঁর সহ গবেষকরা বিশ্বের বিভিন্ন জার্নাল থেকে সংগৃহীত ১০৭টি ক্লিনিক্যাল পরীক্ষাকে বেছে নেন। এগুলির অধিকাংশই হোমিওপ্যাথির কার্যকারিতার দিকে নির্দেশ করছে, কিন্তু পরীক্ষাগুলির গুণমান নিয়ে গবেষকরা উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

হোমিওপ্যাথি যে আদৌ রোগ সারাতে পারে— এই দাবিটিরই আজ পর্যন্ত খুব নির্ভরযোগ্য কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নি, আধুনিক বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে। এই সব ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার কোনও প্রশ্নই আর উঠতে পারে না। তবু আশ্চর্যভাবে ব্যাখ্যার চেষ্টা চলে এবং চলছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের চোখে মূল্যহীন হলেও এ নিয়ে চর্চা জরুরি, কারণ তা না করলে, অযৌক্তিক ভুয়ো চিকিৎসাকে কীভাবে 'জাস্টিফাই' করা হয় সে প্রক্রিয়াটিকে ঠিকঠাক বুঝে ওঠা যাবে না।

হোমিওপ্যাথির ক্রিয়াবিধি : প্রস্তাবিত ব্যাখ্যা ও আধুনিক বিজ্ঞান— হোমিওপ্যাথির ক্রিয়াবিধি নির্ণয়ের প্রশ্নে প্রায়শই বলা হয়ে থাকে, হোমিওপ্যাথি কাজ করে কিনা তা দেখাই যথেষ্ট, কীভাবে কাজ করে তা জানার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এই ধরনের যুক্তির মধ্যে যে কোনও সারবত্তা নেই, তাও বুঝে নেওয়া দরকার। বিজ্ঞানে তত্ত্ব ও প্রয়োগের সমন্বয় যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি জ্ঞানকেও এলোমেলো অর্থহীন হলে চলে

না। অর্থাৎ 'বিজ্ঞান' হয়ে উঠতে গেলে হোমিওপ্যাথিকে অর্থপূর্ণ ও সুসংবদ্ধ জ্ঞান হিসেবেই বিশ্বজনীন জ্ঞানভাণ্ডারের অংশ হয়ে উঠতে হবে। কাজেই, বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তের সঙ্গে কোনও বিরোধ ঘটলে, বিজ্ঞান তাকে অমীমাংসিত বলে ছেড়ে দেবে না। বিজ্ঞানের সব শাখাতেই পরস্পরবিরোধী তথ্য ও 'অত্যাশ্চর্য' পর্যবেক্ষণের নমুনা আছে, কিন্তু প্রাপ্ত তথ্যের সিংহভাগই যে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বকাঠামোর ভিত্তি—এই সত্যটিকে তা যেন ঝাপসা করে তোলার চেষ্টা না করে। আধুনিক বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে হোমিওপ্যাথির অভিযোগ হল, এর প্রস্তাবিত ক্রিয়াবিধি এতটাই বৈপ্লবিক ও বিমূর্ত যে, বিজ্ঞানের দিক থেকে চিরকাল তা কেবল অবজ্ঞা ও অবিচারই পেয়ে এসেছে। ক্যালকুলাস, বিবর্তনবাদ বা কোয়ান্টাম বলবিদ্যাকে বিজ্ঞানে স্বীকৃত হতে এগুলির বিমূর্ততা বা বৈপ্লবিকতা বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি। বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি এগুলি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রভাবশালী বিজ্ঞানীর ব্যক্তিগত অভিমতও। বিজ্ঞানে সুসংগঠিত সংশয়বাদ ভীষণ দামি, হোমিওপ্যাথিকে তা অতিক্রম করেই বিজ্ঞান হয়ে উঠতে হবে, কোনও শর্টকাট রাস্তা খোলা নেই। (চলবে) উ মা

চলে গেলেন বাংলাদেশের বেথুন

জাফরুল্লাহ্ চৌধুরী (১৯৪১-২০২৩)

ভবানীপ্রসাদ সাহু

"কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর জাফরুল্লাহ্ চৌধুরী এলেন। ময়লা এলোমেলো প্যান্ট শার্ট গায়ে, রোদে পোড়া মুখের চামড়া। দেখে মনে হয় না, ইনি এই বিশাল কর্মকাণ্ডের প্রধান রূপকার, ম্যাগসেসে পুরস্কার আর বিকল্প নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত একজন। ইনি এখন মাঠের কাজ সেরে এলেন। গণস্বাস্থ্যকেন্দ্রের আবাসিক কর্মী —সবাইকেই সকালে ঘণ্টা দেড়েক মাঠের কাজ করতে হয়। তিনি সাধারণ কর্মীই হোন বা চিকিৎসক কিংবা ডাইরেক্টর পদের কেউ হোন।"

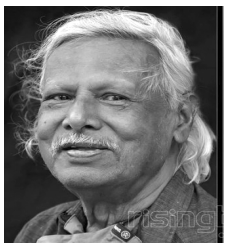

''গণস্বাস্থ্যকেন্দ্রের গণবেকারিতে বানানো কেক, সঙ্গে দুধ ছাড়া চা খেতে খেতে জাফরুল্লাহ্ চৌধুরীর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা হল। চিকিৎসা, ওষুধনীতি, এনজিও, কোরাণ, মৌলবাদ, স্বাস্থ্য আন্দোলন—নানা বিষয়েই টুকটাক কথাবার্তা চলল ঘণ্টাখানেক। দৃঢ় প্রত্যয়ে গভীর গলায় বলা তাঁর মতামত...।"

১৯৯৩ সালের ২২ আগস্ট, দ্বিতীয়বারের জন্য বাংলাদেশে গিয়ে জাফরুল্লাহ্ চৌধুরীকে প্রথম দেখা আমার অভিজ্ঞতা ছিল এইরকম। প্রায় ত্রিশ বছর আগের কথা —সব মনে থাকার কথা নয়। তখন ফিরে এসে বইয়ের আকারে নিজের অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য নানা আলোচনাসহ যা প্রকাশিত হয়েছিল, তার থেকেই উপরের উদ্ধৃতি। (এখন এ বইটি 'বাংলার মুক্ত মনের এক ঝলক' নামে জ্ঞানবিচিত্রা প্রকাশ করেছে।) এর আগে ১৯৮৯-এ বাংলাদেশে গিয়ে গণস্বাস্থ্যকেন্দ্রে গেলেও জাফুরুল্লাহ্ বিদেশে থাকায় দেখা হয় নি।

নিজের ব্যক্তিগত ঐ অভিজ্ঞতা থেকে জাফরুল্লাহ্র একটি পরিচয় পাওয়া যায়। কানাডার ডা. নর্ম্যান বেথুন একজন দক্ষ শল্যচিকিৎসক হয়েও ভবিষ্যতের প্রচুর অর্থোপার্জন আর নিশ্চিত স্বচ্ছন্দ জীবনের মোহ ত্যাগ করে স্পেন ও কানাডার যুদ্ধরত সৈনিক ও মানুষের সেবায় আমৃত্যু কাজ করে গেছেন। ডা. জাফরুল্লাহ্ চৌধুরীর মধ্যেও যেন ডা. বেথুনের ছায়া অনুভব করা যায়। জন্মেছিলেন চট্টগ্রামের রাউজানে, ১৯৪১-এর ২৭ ডিসেম্বর। ১৯৬৪ সালে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম বি বি এস পাশ করে লন্ডনে যান এফ আর সি এস পড়তে। সার্জারির এই চার বছরের পাঠক্রম সাফল্যের সঙ্গেই শেষ করেছিলেন। কিন্তু ফাইনাল পরীক্ষার অল্প কয়েকদিন আগে খবর পেলেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের। এক বিলেতফেরৎ প্রতিষ্ঠিত সার্জেনের আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার মোহ ত্যাগ করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামী দেশবাসীর পাশে। ছিঁড়ে ফেলেন পাকিস্থানী পাসপোর্ট।

অনেক বাধা বিপত্তি পেরিয়ে ১৯৭১-এর মে মাসের শেষে পৌঁছন ত্রিপুরার আগরতলায় মুক্তিযুদ্ধের ২ নম্বর সেক্টরে। সঙ্গী ছিলেন আরেক হৃদশল্যবিদ ডা. এম এ মবিন। ওখানেই একটি আনারস বাগানে গড়ে তুললেন মুক্তিযুদ্ধে আহত সৈনিকদের জন্য ৪৮০ শয্যার 'বাংলাদেশ ফিল্ড হাসপাতাল' —ছন-এর বেড়া, বাঁশের ছাদ দিয়ে। ডা. বেথুনের মতো নিরলসভাবে আহতদের সেবা ও অস্ত্রোপচার করা শুধু নয়, প্রশিক্ষণ দিয়ে

গড়ে তুললেন প্যারামেডিক বাহিনী। ১৯৭১-এর ডিসেম্বরে বাংলাদেশ জন্ম নেওয়ার পর এটি স্থানান্তরিত হল নতুন বাংলাদেশে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান-এর পরামর্শে নাম পাল্টে জাফরুল্লাহ্-রই প্রস্তাবিত নাম রাখা হল--- 'গণস্বাস্থ্যকেন্দ্র'। ঢাকা-র অদূরে সাভার-এ দান হিসেবে পাওয়া ২৮ একর জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হল এটি।

ডা. জাফরুল্লাহ্ চৌধুরী একে শুধু একটি নিছক হাসপাতাল নয়, সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পীঠভূমি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করলেন এবং তা কোনো শ্লোগান-মিছিল করে নয়, বাস্তব কাজে প্রয়োগ করে। এর আংশিক পরিচয় শুরুতেই দেওয়া হয়েছে। আছে আরো অনেক কিছুই। গিয়ে দেখেওছিলাম, কিভাবে মেয়েদের আত্মসম্মানের সঙ্গে ড্রাইভার থেকে পাদুকা কারখানার কর্মী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গণস্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রায় আড়াই হাজার কর্মীর মধ্যে কমপক্ষে এক হাজারই নারী। কাজের সময়ের একটি অংশ পড়াশোনা করার জন্য। অর্থাৎ আট ঘণ্টা ডিউটি থাকলে তার দু'ঘণ্টাই পড়া, আলোচনা, বক্তব্য রাখা ইত্যাদির জন্য এবং তা ডিউটিরই অংশ। তবে গণস্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এটি বাস্তব সত্য যে এই বিশাল কর্মযজ্ঞের মূল কারিগর ছিলেন জাফরুল্লাহ্—বছরের পর বছর পড়ে থেকে সবকিছু গড়েছিলেন। গড়েছিলেন ১০০ শয্যার অত্যাধুনিক ডায়ালিসিস কেন্দ্রও।

তাঁরই উদ্যোগে ১৯৮২ সালে বহুজাতিক ওষুধ ব্যবসায়ি আর চিকিৎসাকে কেন্দ্র করে চলা চরম জনবিরোধী ব্যবসায়িক ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে প্রণয়ন করা হয় বাংলাদেশের জাতীয় ওষুধ নীতি। এটি তখন ছিল এই উপমহাদেশের আমলে একটি বিরাট উদাহরণ ও পথিকৃৎ। তখন আমাদের এখানকার গণবিজ্ঞান আন্দোলনের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কাজেও তার প্রভাব পড়েছিল। গণস্বাস্থ্যকেন্দ্রে জেনেরিক নামের নানা প্রয়োজনীয় ওষুধ উৎপাদনও শুরু হল।

মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে থাকার মানসিকতায় তাঁর সমগ্র জীবনযাপন সম্পৃক্ত হয়ে ছিল। এই কারণে নিজে কোভিড আক্রান্ত হয়ে ঢাকার কোনো সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে এবং ব্যয়বহুল অ্যান্টি ভাইরাল ওষুধ দিয়ে নিজের চিকিৎসা করান নি। নিজের কিডনির বৈকল্য ধরা পড়ার পর বিদেশী বন্ধুদের পরামর্শে বিদেশে গিয়ে কিডনি প্রতিস্থাপন না করে, গণস্বাস্থ্যকেন্দ্রেই ডায়ালিসিস করান। তাঁর মানসিকতার অন্য আরেকটি দিকের উল্লেখও করা দরকার।

১৯৯২ সালে আহমেদাবাদের টাউন হলে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সকল ধর্মের প্রতি পারস্পরিক মমত্ববোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে এক নাগরিক সভার আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করার জন্য উদ্যোক্তারা টিকিট পাঠিয়ে ঢাকা থেকে নিয়ে যান ডা. জাফরুল্লাহ্ চৌধুরীকে। মূল বক্তা ছিলেন মহাত্মা গান্ধীর পৌত্র দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বাজমোহন গান্ধী। ভিড়ে ঠাসা টাউন হলে অনুষ্ঠান শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই সামনের সারিতে বসা মৌলবাদী কিছু ব্যক্তি অনুষ্ঠানে 'একজন মুসলমানকে সভাপতি নির্বাচন করায়' ('তাও আবার ভারতীয় নয়, বাংলাদেশী মুসলমান') ক্ষিপ্ত হয়ে নানা বিরূপ মন্তব্য ও প্রশ্ন শুরু করে। জাফরুল্লাহ্ তখন ভাঙ্গা হিন্দিতে স্পষ্টভাবে বলেন— ''আমিও আপনাদের সবাইকে একটা প্রশ্ন করছি। আপনারা উত্তর ভেবে রাখুন। শহরে টাঙ্গানো হাজার হাজার পোস্টারে আমার নাম না দেখলে, আপনারা প্রথমবারের মতো এখানে এসে আমাকে সরাসরি দেখে কি বলতে পারতেন —আমি হিন্দু না মুসলমান? আমার সাথে আপনাদের তফাৎ কোথায়? আমার চেহারা বা কপালে কি লেখা আছে, আমি কোন্ ধর্মাবলম্বী বা পূর্বপুরুষের কোন্ ধর্ম ত্যাগ করে নতুন ধর্ম গ্রহণ করেছি? না, কোন্ ধর্ম আচার পালন করি? ...প্রচলিত ধর্মগুলোর কোনোটার কোনও চিহ্ন কি আমার চেহারা সুরতে ছাপ মারা আছে? যার যার ঈশ্বর, ভগবান, খোদাকে স্মরণ করে, বুকে হাত দিয়ে উত্তর ভাবুন।" সভা নিশ্চুপ হয়ে যায়।

এবং এর আর ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। এটি সংগ্রহ করা হয়েছে ঢাকার গণস্বাস্থ্যকেন্দ্রর প্রকাশ বিভাগ গণপ্রকাশনী প্রকাশিত জাফরুল্লাহ্-র বিভিন্ন লেখার সংকলন গ্রন্থ 'ওষুধ একটি পণ্য'-এর 'গান্ধী পরিবারের ভালবাসা : ডা. জোহরা বেগম কাজী' শিরোনামের লেখা থেকে। এই সংকলন গ্রন্থের আরেকটি লেখার শিরোনাম 'লেনিনের স্বাস্থ্যভাবনা থেকে মুক্তিযুদ্ধের ফিল্ড হাসপাতাল'। এইভাবে গণস্বাস্থ্যকেন্দ্র সহ অন্যান্য নানা স্বাস্থ্যসংক্রান্ত কাজে নিরলস ব্যস্ততার মধ্যেই অজস্র লেখা নানা সময়ে নানা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। গণপ্রকাশনী এইসব লেখা নিয়ে আরো বেশ কয়েকটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করেছে।

এই গণপ্রকাশনীর কর্ণধার তথা গণস্বাস্থ্যকেন্দ্রের স্বাস্থ্য পত্রিকা 'মাসিক গণস্বাস্থ্য'-র কয়েক দশকের সম্পাদক বজলুর রহিম ২০২৩-এর মার্চে কলকাতায় এসেছিলেন। এই পত্রিকায় লেখার সূত্রে ও কয়েকবার নানা স্থানে দেখা সাক্ষাতে কিছুটা ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল। তখনই শুনেছিলাম জাফরুল্লাহ্ চৌধুরীর ডায়ালিসিস চলছে এবং শরীর খুব খারাপ। কিন্তু তারপর এত তাড়াতাড়ি ১১ এপ্রিল তাঁর মৃত্যু হবে তা অভাবিত ছিল।

স্বল্পপরিসরে ডা. জাফরুল্লাহ্ চৌধুরীর কর্মকাণ্ড ও মানসিকতাকে তুলে ধরা সম্ভব নয়। শুধু বাংলাদেশে নয়, দক্ষিণপূর্ব এশিয়া বা বলা ভালো আন্তর্জাতিকভাবেই মানুষের

স্বাস্থ্য আন্দোলনে তিনি ছিলেন এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। একই সঙ্গে ছিল সাম্প্রদায়িক চেতনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত বিজ্ঞানমনস্ক; অন্যদিকে মেহনতি মানুষ থেকে অর্ধেক আকাশ যে নারী—তাঁদের নিয়ে সমাজবৈজ্ঞানিক ভাবনা। দুঃখের বিষয় ক্রমবর্ধমান মুনাফার জন্য বলিপ্রদত্ত বর্তমান স্বাস্থ্যব্যবস্থা এবং অবশ্যই অবিজ্ঞানের কারবারি মানুষজন এমন একজনকে ক্রমশ ভুলিয়ে দিতে চায়। কিন্তু বিজ্ঞান আন্দোলনের কর্মীরা জাফরুল্লাহ্ চৌধুরীর জীবন, কর্মকাণ্ড, মনন ও তাঁর নিজের দৈনন্দিন জীবনে প্রতিফলিত শিক্ষা থেকে নিজেদের আরো শিক্ষিত ও অনুপ্রাণিত করবেন, এটিই প্রত্যাশিত।

জাফরুল্লাহ্ চৌধুরীর লেখা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থঃ বাংলাদেশের দুই অবিস্মরণীয় নেতা ও মুক্তিযদ্ধ; ঔপনিবেশিকরণের একটি কৌশল, এক চুমুকে পকেট লোপাট, ওষুধ একটি পণ্য। উ মা

সৌমেন স্যার

দীপঙ্কর দে

সৌমেন্দ্রনাথ মুখার্জি—এই নামটা হয়তো অনেকের কাছে ঠিক চেনা ঠেকবে না, কিন্তু সৌমেন মুখার্জি? আকাশ-পাগল যত মানুষ আছেন তাঁরা বোধহয় এক ডাকে চিনবেন এই মানুষটিকে। তিনি কারোর কাছে শুধু 'সৌমেন', কারো কাছে 'সৌমেনদা'। আমাদের কাছে স্কাই ওয়াচার্স অ্যাসোসিয়েশনের 'সৌমেন স্যার'। যাঁরা নতুন কিছু শেখান, আমরা কথায় বলি তিনি যেন আমাদের কাছে এক নতুন জগতের দরজা খুলে দিলেন। সৌমেন স্যারের ক্ষেত্রে এটি আক্ষরিক অর্থেই সত্যি। স্কাই ওয়াচার্স অ্যাসোসিয়েশনের ঢাকুরিয়ার অফিস স্যারের ঘরেই, তাই অনেকের মতোই আমার জন্যও আকাশের দরজা খুলে দিয়েছিলেন এই মানুষটি আজ থেকে প্রায় আট বছর আগে।

মনে পড়ে, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ আমি ও আমার বন্ধু অভিষেক শনিবার হাজির 'আকাশ দেখার ক্লাব'-এ (ঢাকুরিয়া অঞ্চলে এই নাম বললেই লোকজন বাড়ি দেখিয়ে দেয়)। কলিং বেল বাজাতেই দরজা খুললেন ছিপছিপে চেহারার একজন মানুষ, মাথায় সাদা চুল, পরনে সাদা গেঞ্জি আর লুঙ্গি, বললেন 'আসুন স্যার'। বেশ অবাক হলাম আমরা, পরে জানতে পারলাম অ্যাসোসিয়েশনে সবাই সবাইকে 'স্যার' বলে সম্বোধন করেন। ঘরের ভেতরে সারি সারি টেলিস্কোপ, তার মধ্যে সবচেয়ে বড়টা হল একটা প্রতিফলক টেলিস্কোপ, যার অবতল আয়নাটির ব্যাস ৯ ইঞ্চি। সেটাকে ছাদে তুলে মাউন্টের ওপর বসিয়ে মই-এ চড়ে তবে পর্যবেক্ষণ করতে হয়, সে এক বিরাট আয়োজন; জানতে পারলাম এই টেলিস্কোপের পুরোটাই সৌমেন স্যার আর রানা স্যারের হাতে তৈরি। যাই হোক, কিছুদিন যাতায়াত চলল বটে, তবে আকাশ চেনার ব্যাপারটা কেমন যেন থমকে থমকে এগোচ্ছিল, ততদিনে সৌমেন স্যারের সাথে বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। হ্যাঁ, বন্ধুই বটে। এর অনেক পরে যখন স্যারের সাথে অচেনা কোথাও গেছি সেখানে কেউ আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে স্যার বলতেন, 'আমার বন্ধু', তাতে হয়তো প্রশ্নকর্তার মনের শান্তি হত না, কিন্তু আমরা দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে খানিক হেসে নিতাম। নাহ্, সব গুলিয়ে যাচ্ছে। আবার ফিরে আসি সেই শুরুর দিনগুলোতে। আকাশ চিনব বলে আমরা দুজন ধরে বসলাম সৌমেন স্যারকে। স্যার বললেন, 'চার্ট চিনতে হবে স্যার, তবে আকাশ মেলাতে পারবেন, জোগাড় করে নিন।'

জোগাড় হল—স্যারেরই লেখা বই 'আকাশ দেখার হাতেখড়ি' দিয়ে শুরু হল আমাদের আকাশে হাতেখড়ি। এই বইয়ের শেষেই দেওয়া আছে স্টার চার্ট, এক কথায় বললে আকাশ দেখার মানচিত্র। কিন্তু কোথায় কি মেলাব! ম্যাপের চারটে পাতা জুড়ে শুধু একগাদা ছোট-বড় কালো বিন্দু—সেগুলোই নাকি তারা আর এদেরকেই আকাশে মেলাতে হবে এই ম্যাপ থেকে। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার মতোই অবস্থা, অতএব আমরা ফের স্যারের শরণাপন্ন হলাম। সৌমেন স্যার আমাদের কথা শুনলেন আর তাঁর স্বাভাবসিদ্ধ শান্ত ভঙ্গিতে বললেন, 'তারা তো অনেক।' উত্তর শুনেই বুঝলাম অন্য কোনও উপায় নেই, ঐ অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো চারপাতার চার্টের কালো থেকেই উদ্ধার করতে হবে। ফের হাল ধরলেন সৌমেন স্যার, হাতে ধরে শেখালেন চার্ট মেলানো, টেলিস্কোপ চালানো, তার চিনে টেলিস্কোপ তাক করাও শিখলাম স্যারের কাছ থেকে। এবার নিজেরা বুঝলাম কেন আকাশ-পাগল মানুষেরা স্যারকে একডাকে চেনেন; কারণ এই মানুষটা আকাশের নাড়ি-নক্ষত্র চিনতেন। সেই শুরু, তারপর চারপাতার চার্টের জায়গায় হাতে এল নর্টন স্টার চার্ট, তাতে তারার ভিড় আরও খানিক বাড়ল। কলকাতার আকাশে আলোর বড় বাড়াবাড়ি তাই ঠিক হল কাছেপিঠে কোনও অন্ধকার জায়গায় গিয়ে তার দেখার কাজ চলবে, আমাদের ভাষায় 'ছোট ক্যাম্প'। আর এই ছোট ক্যাম্পে আমাদের প্রধান শিক্ষক ছিলেন সৌমেন স্যার। Deep Sky Object খোঁজার কাজ শুরু হল স্যারের তত্ত্বাবধানে, সেই প্রথম দেখলাম আকাশের ম্যাপ

বই, Urenometrial স্যার একের পর এক পাতার নম্বর বলে যাচ্ছেন আর আমরা সেই পাতার তারা মিলিয়ে টেলিস্কোপে একে একে খুঁজে বের করছি open star cluster, globular star cluster, nebula, galaxy। সারারাত জুড়ে সে এক অদ্ভুত নেশা। আমরা ২৫-২৬ বছরের কয়েকজন আর ৭৫ বছর বয়সী আমাদের এক বন্ধু—কারোর চোখে ঘুম নেই, শুধু তারা আর তারা। খানিকক্ষণের ফাঁকি দিলেই শুনতে পেতাম, 'এরকম আকাশ সব জায়গায় পাবেন না স্যার, টেলিস্কোপে না হলেও খালি চোখে চার্ট মেলান।' স্যারের তৈরি করে দেওয়া মহাজাগতিক বস্তুর তালিকা এখনও ব্যবহার করি, তবে এখন ফাঁকি দিতে পারি খানিকক্ষণ, এই হল পার্থক্য।

সৌমেন স্যার একসময় নিয়মিত টেলিস্কোপ তৈরি করতেন, একথা আমরা শুনেছিলাম, আর সেই থেকেই ইচ্ছে ছিল নিজের হাতে টেলিস্কোপ তৈরি করার। সেই কথা যেই না স্যারকে বলা অমনি উত্তর এলো, 'দুটো আট ইঞ্চির কাঁচ আছে। তোমরা চাইলে শুরু করতে পারো।' ব্যস, আমাদের আর পায় কে! শনিবারের বদলে প্রায় রোজ যেতে শুরু করলাম ঢাকুরিয়া আর স্যারও সারা দুপুর বসে থাকতেন আমাদের সাথে। কত গ্রেডে কাঁচ ঘষা হবে, কিভাবে তারপর সেটা ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে, কাঁচ ঠিকভাবে অবতল হচ্ছে কিনা, তার বক্রতা ঠিক আছে কিনা, সমস্ত কিছু চলতে লাগল। যেন স্যার পুরনো দিনে ফিরে গিয়ে নতুন করে টেলিস্কোপ বানাতে শুরু করেছেন। প্রায়ই বলতেন, 'আমার আর এখন ক্ষমতা নেই স্যার, টেলিস্কোপ তৈরি করা অনেক খাটনি।' কিন্তু যখন আবার কাজ শুরু হল তখন স্যার সবার আগে সেখানে থাকতেন। যদি কাজ করার সময় কোনও জিনিস অমিল হত, পরের দিন গিয়ে ঠিক দেখা যেত স্যার জিনিসটা জোগাড় করে রেখেছেন। যদি মনে করেন সবকিছু উনি দোকান থেকে গিয়ে নিয়ে আসতেন তা নয়, বাড়ির প্রায় সবকিছু দিয়ে দিতেন এইসব কাজের জন্য। আমরা ইতস্তত করতাম, কিন্তু স্যার বলতেন, 'যা লাগে নিয়ে নিন স্যার...'। সেই 'যা লাগে'-র মধ্যে যেমন ছিল রান্নাঘরের বাটি, গামলা, কাঁচের শিশি, তেমনই ছিল অয়েল ক্লথ, চাদর ইত্যাদি। স্যার যে শুধু নিজে অগুনতি টেলিস্কোপ তৈরি করেছেন তাই নয়, নিজের তৈরি টেলিস্কোপে নিয়মিত পরিবর্তনশীল তারা পর্যবেক্ষণ (Variable Star Observation) করে American Association for variable Star Observation (AAVSO)-তে তথ্য পাঠাতেন। দীর্ঘদিন AAVSO-র সদস্য ছিলেন সৌমেন স্যার। এছাড়া বিভিন্ন মহাজাগতিক ঘটনা যেমন উল্কাবৃষ্টি, সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, নোভা প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ এবং সেগুলি থেকে নানান তথ্য সংগ্রহ করা ছিল স্যারের নিয়মিত কাজ। কাজের প্রতি নিষ্ঠার এতটুকু অভাব ছিল না, টেলিস্কোপের যাবতীয় সমস্যার মুশকিল আসান সেই একজন —সৌমেন স্যার।

এরপর যতদিন গেছে স্যারের সাথে নানান বিষয়ে মত বিনিময়ের সুযোগ হয়েছে। সমাজ, রাজনীতি, বিজ্ঞান, সাহিত্য সব বিষয়েই আলোচনা বেশ জমে উঠত। সুকুমার রায় আর পরশুরাম ছিল কণ্ঠস্থ, কত যে অজানা গান স্যার গাইতেন—মাটির সুর খুব সহজেই স্যারের গলায় ভেসে আসত। 'আকাশ দেখার হাতেখড়ি'-র পুনর্মুদ্রণ যখন হল তখন স্যারের সাথে পুরোপুরিভাবে এই কাজে যুক্ত থাকার সুযোগ পাওয়া গেল। প্রেসে যাওয়া, প্রুফ দেখা, নতুন কিছু সংযোজন হলে সেটা পড়ে দেখে স্যারের সাথে আলোচনা করা—সব কিছুই চলতে থাকল। নতুন কিছু সংযোজন করলে, তখনই সেটা ই-মেলে পাঠিয়ে ফোন করে বলতেন, 'নিজের মতো পড়বেন স্যার। সবাই বুঝবে কিনা সেটা ভেবে দেখবেন, যদি মনে হয় জটিল হয়ে যাচ্ছে তাহলে বাদ দিয়ে দেব।' বেশিরভাগ সময় আমার উত্তর হত, 'আমি আবার কি পড়ব স্যার! আপনি তো ভেবেই লিখেছেন।' কিন্তু মানুষটা যে সৌমেন স্যার, উত্তর আসত, 'ওটাই তো স্যার—আমি ভেবে লিখেছি, এবার আপনি ভেবে দেখুন ভাবাটা পরিষ্কার হয়েছে কি না।' সৌমেন স্যারের আরও একটি বই 'আকাশ দেখা' প্রধানত যাদের টেলিস্কোপ আছে তাদের জন্য লেখা। কখনো স্যারকে দেখি নি বই বিক্রি করার জন্য উতলা হতে, কেউ বই কিনতে চাইলে আগে জিজ্ঞাসা করতেন টেলিস্কোপ আছে কি না। উত্তর 'না' হলে সরাসরি বলতেন, 'তাহলে 'আকাশ দেখার হাতেখড়ি' নিন স্যার 'আকাশ দেখা'য় সুবিধে হবে।' খুব তাড়াতাড়ি স্যারের আরো দুটো বই প্রকাশিত হবে, তার মধ্যে একটি 'ক্যালেন্ডারের কথা'-র পুনর্মুদ্রণ এবং অন্যটির প্রথম সংস্করণ, 'ফলিত জ্যোতিষ বিজ্ঞান নয়'। কিন্তু প্রুফ দেখার পর সেই আলোচনাগুলো আর হবে না। সৌমেন স্যার চিরকাল জোর দিয়েছেন সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ এবং মানুষের মনের ভ্রান্ত ধারণা ও অন্ধবিশ্বাস নির্মূল করা দিকে। স্যারের লেখা বইগুলো সেই কাজ করে যাবে আরও বহুদিন।

ঢাকুরিয়ার ঘরটা আছে কিন্তু গত ১৭ মার্চ সেই ঘরের প্রাণপুরুষ বিদায় নিয়েছেন। একদিন স্যার আকাশ-বাড়ির দরজা খুলে দিয়েছিলেন। আর আজকে মনে হয় স্যার বলছেন, 'এবার আপনারা দরজা খুলে দিন স্যার অন্যদের জন্য। যতবার টেলিস্কোপ তাক করে খুঁজব কোনও তারা শুনতে পাব, 'key star-টা field দেখে confirm হয়ে নিন স্যার, নইলে কিন্তু কোনও লাভ নেই।' আকাশ দেখানোর কোনও অনুষ্ঠানে যখন টেলিস্কোপ দেখতে আসা আগ্রহী চোখের উত্তর দেব, তখন মনে পড়বে, 'ততটুকু বলবেন স্যার, যতটা দিয়ে বোঝানো যায়। আপনি কতটা জানেন সেটা জাহির করা জরুরি নয়, লোকে কি বুঝল সেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।' কোনও বিষয়ে স্যার নিজে সামনে থাকতে চাইতেন না, নিরলসভাবে কাজ করে যেতেন কিন্তু কখনও আত্মপ্রচার করতেন না বা করতে চাইতেনও না। এইসব প্রসঙ্গ উঠলেই বলতেন, 'আমাকে না জড়ালে পুরো সাপোর্ট...'। কিন্তু কি আর করি স্যার, আপনি যে সব কিছুতেই জড়িয়ে গেছেন, বলা ভালো জড়িয়ে দিয়ে গেছেন।

উমা

পুস্তক সমালোচনা

স্বাস্থ্যের সন্ধানে অথবা অসুস্থতার খোঁজে —যুক্তি তর্ক আর গল্প

লেখক — দেবাশিস মুখার্জী। প্রকাশক — চার্বাক।
প্রকাশকাল — জানুয়ারি ২০২৩। পৃষ্ঠা সংখ্যা -৩৩৬। মূল্য - ৪০০ টাকা

লেখক নিজেকে পরিচিত করাচ্ছে একজন স্বেচ্ছাসেবক ও স্বাধীন বিজ্ঞান গবেষক হিসাবে, যিনি গ্রাম ও আদিবাসী উন্নয়নের কাজ করেন। প্রাগৈতিহাসিক আদিম মানুষ ব্যক্তিগত অথবা গোষ্ঠীগত পরিসরের ইচ্ছা-অনিচ্ছা ব্যতিরেকে উন্নয়নের বেশ কয়েকটি সোপান পেরিয়ে আজ আধুনিক মানুষ হয়েছে। ভাষা ও বুদ্ধি বিপ্লব, কৃষি-বিপ্লব, বিজ্ঞান-বিপ্লব, শিল্পবিপ্লবের ধাপ পেরিয়ে, মহাকাশে মানুষ পাঠিয়ে ও ইদানীংকালে কৃত্রিম বুদ্ধির যন্ত্র বানিয়ে আধুনিক মানুষ এখন দীর্ঘায়ু ও আরামপ্রিয় হয়েছে। সারাদিন শিকার বা খাবারের সন্ধানে থেকে দুবেলা পেটপুরে না খেতে পাওয়া গুহাবাসী কঠোর পরিশ্রমী মানুষ এখন যন্ত্রনির্ভর কৃষি ও শিল্পের অবদানে চার দেওয়ালের নিরাপত্তায় সোফায় আরাম করে শুয়ে বসে তার নিশ্চিত জীবন কাটাতে পারছে। লেখক প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করেছেন, মানুষের সেই টেনে লম্বা করা আয়ু আনন্দের হচ্ছে কী? আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি, মানুষের সেই দীর্ঘ জীবনে সুখের বদলে অসুখের মাত্রা ক্রমশ মাত্রাছাড়া হয়ে যাচ্ছে। মাঝবয়স অতিক্রম করা বেশিরভাগ মানুষের খাবারের চেয়ে রোগ নিরাময় বা নিয়ন্ত্রণের জন্য বেশি রসদ খরচ করেছেন।

লেখক অসংখ্য উদাহরণ, যুক্তি দিয়ে মানুষের আদিম অবতার থেকে আধুনিক হওয়ার উন্নয়নের প্রাসঙ্গিক আলোচনা করেছেন পনেরোটি অধ্যায়ে। দুই মলাটের মধ্যে উল্লেখ করা আছে আদিম মানুষের সময় থেকে আধুনিক মানুষের সময়ে যাত্রার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। পঁচিশ লক্ষ বছর আগে বিবর্তিত মানুষের বংশাণু বা জিন বহনকারী আধুনিক মানুষের খাদ্য ও পরিশ্রমের অভ্যেস পাল্টে নেওয়া জীবনে সুস্বাস্থ্যের অভাব। কৃষি বিপ্লবের হাত ধরে আসা পরিবেশ দূষণকারী কীটনাশক, রাসায়নিক সার, আর জি এম (জেনেটিকালি মডিফায়েড) শস্যবীজে কৃষির নির্ভরশীলতা। যার ফলে প্রাকৃতিক শস্য এখন ইতিহাসের গর্ভে বিলুপ্ত। স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজনে প্রাকৃতিক খাবারের বদলে আমরা প্রকৃতিকে পাল্টে নিয়ে কৃত্রিম একটুকরো প্রকৃতির রসায়নাগারে তৈরি হচ্ছে কৃত্রিম শস্য, সবজি, ডিম, মাছ, মাংস। আমরা বাধ্য হচ্ছি কেবল সেই খাবার খেতে। লেখক মনে করিয়ে দিচ্ছেন—আলুর চিপস না খেলেও, খোদ আলুটাই যে কৃত্রিম!

লেখক চিকিৎসক না হলেও তিনি সাবলীলভাবে মানুষের শরীরতত্ত্ব ও মানবমন নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন, যার গভীরতা একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সমীহা দাবি করে। আধুনিক মানুষের নিজের হাতে তৈরি এই কৃত্রিম পরিমণ্ডলে মানুষের রোগভোগ বাড়ছে। এটা অজানা নয়, তবু এটা জানার, জানানোর আর বিশ্লেষণের কাজ তেমনটা চোখে পড়ে না বৈজ্ঞানিক ও শৈল্পিক উন্নয়নে উন্নীত বর্তমান হোমো ডিজিটালিসের (শব্দটি ধার করা) পথে ধাবিত হোমো সেপিয়েন্সদের। সেই নিরিখে দেবাশিস মুখার্জী এক অনন্য দলিল তৈরি করেছেন। এই বইটি পড়তে হবে ধীর লয়ে। পঁচিশ লক্ষ বছর আগে বিবর্তিত রোগবিহীন প্রথম মানুষ (হোমোসেপিয়েন্স) থেকে আধুনিক মানুষের অর্জিত সুস্থতা- অসুস্থতা, সুখ-অসুখ, ডাক্তার-বদ্যি-ওঝা-হেকিম-ঝাড়ফুঁক ...থেকে হাতুড়ে ডাক্তারের নিজের হাতে বানানো, গায়ে কাগজের খোপকাটা শিশির মিকচার...মায় আমেরিকার এফডিএ সম্মতি নেওয়া ক্রমবর্ধমান দুর্মূল্য ট্যাবলেট, ইনজেকশন, স্টেন্ট, কৃত্রিম হাঁটু ইত্যাদি আধুনিক সচ্ছল ও অসচ্ছল মানুষদের অর্জিত দীর্ঘ জীবন নিশ্চিন্তে উপভোগ করতে দিচ্ছে না। এই যে অপ্রাপ্তি সেটাও আধুনিক মানুষ জানে না। এই সেদিন কর্পোরেট জগতে বসবাস করেন মেদভারে ভারিক্কি এক তরুণ, যিনি প্রতিদিন কর্পোরেট দুনিয়ায় উপলব্ধ বিনে পয়সায় পিৎজা আর কোক দিয়ে লাঞ্চ সারেন—তিনি যখন এস্কালেটর নেই এমন স্টেশনের ওভারব্রিজ পেরোতে গিয়ে দুই-তিনবার দাঁড়িয়ে হেপো রুগীর মতো খাবি খেলেন। তিনি হয়ত জানেন ব্রিজের ওপারে স্টেশনের বাইরে তার ঠাকুরদা পাঁচ কিলোমিটার হেঁটেই এসেছেন তাঁর শহুরে নাতিকে দেশের বাড়িতে নিয়ে যেতে।

বইটিতে তত্ত্বগত কিছু ভুলভ্রান্তি আছে, যেটার জন্য বক্তব্য শক্তিহীন হয়ে যায় না, যুক্তি দুর্বল হয়ে যায় না। এমনই একটি আধটু ভুল আছে ৩০৩ পৃষ্ঠায়—'অন্যদিকে আমাদের শ্বাস

নেওয়ার সময় আমাদের সিম্প্যাথেটিক নার্ভ সক্রিয় থাকে আর শ্বাস ছাড়ার সময় প্যারা সিম্প্যাথেটিক নার্ভ সক্রিয় হয়। এই সক্রিয়তার ফলেই আমরা যখন শ্বাস নিই তখন আমাদের হৃদগতি বাড়ে আর যখন আমরা শ্বাস ছাড়ি তখন আমাদের হৃদগতি কমে।' শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াটি সঠিক আর এর বৈজ্ঞানিক পরিভাষা 'সাইনাস এরিদমিয়া' এবং রীতিমত একটি স্বাভাবিক অবস্থা। তবে এর পেছনে সিম্প্যাথেটিক নার্ভের ভূমিকা নেই। প্যারা সিম্প্যাথেটিক নার্ভ হিসাবে ভেগাস নার্ভের একটা ভূমিকা অবশ্য আছে, যেটা গৌণ। শ্বাস টানা ও ছাড়ার সময় বুকের মধ্যের বায়ুর চাপ যথাক্রমে বাড়ে ও কমে। ফলে পর্যায়ক্রমে হৃদপিণ্ডে সারা শরীর থেকে ফেরত আসা রক্তের জোগান যথাক্রমে কমে ও বাড়ে। রক্তের জোগান কমলে একই পরিমাণ রক্ত সরবরাহ করতে হলে হৃদপিণ্ডকে দ্রুত পাম্প করতে হয়, কারণ তখন প্রতিটা হৃদস্পন্দনে কম পরিমাণে রক্ত নির্গত হয়। অন্যদিকে রক্তের জোগান বাড়লে এর কারণেই হৃদস্পন্দন হ্রাস পায়। হৃদস্পন্দন, পরিপাক, শ্বাস নেওয়া ইত্যাদি যাবতীয় শারীরিক কর্মকাণ্ডের প্রথমে, মধ্যে ও অন্তিমে স্নায়ুর একটা ভূমিকা থাকেই, যেমনটা শহরের রাস্তায় ট্রাফিক লাইট। ট্রাফিক লাইটের পিছনে কর্মকাণ্ডটা জানা দরকার। ঘটনাচক্রে উল্লেখযোগ্য, এই ঘটনা, মানে 'সাইনাস এরিদমিয়া' একটি অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর বৈশিষ্ট্য, শৈশবে ও কৈশোরে আমাদের থাকে বুড়ো হলে আর থাকে না।

অসংখ্য ঐতিহাসিক তথ্য, নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও তার যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণের বোঝা নিয়ে বইটি কিছুটা ভারাক্রান্ত, একনাগড়ে পড়তে কিছু পাঠকের অসুবিধা হতে পারে। এটাকে পাঠ্য বইয়ের মতো করে অল্প অল্প করে পড়লে লেখকের সাথে একাত্ম হবার যুযোগ মেলে। তবে বইটা তো মানুষের ইতিহাসের নিরিখে আধুনিক মানুষের স্বাস্থ্যের আর অসুস্থতার সন্ধান! অসংখ্য প্রশ্ন আছে বইটিতে, যার উত্তর আমাদের জানা নেই। লেখক আমাদের কাছে অসংখ্য প্রশ্ন নিয়ে এসেছেন। উত্তর খোঁজার দায় আমাদের অথবা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের। এককথায় বইটি অবশ্যপাঠ্য ও সংগ্রহে রাখার মতো একটি দলিল।

গৌতম মিস্ত্রী উ মা

প্লাস্টিক দূষণ ও কোকাকোলা-পেপসি

আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে দেশে এক বোতল ঠাণ্ডা পানীয়ের দাম ছিল ২৫ পয়সা। কাঁচের বোতল দোকান থেকে নিয়ে এলে ৫ পয়সা জমা রাখতে হত। ২০০ মিলিলিটার বোতল ফেরত দিলে জমা পয়সা ফেরত পাওয়া যেত। প্লাস্টিক বোতল বাজারে আসার সঙ্গে সঙ্গে বোতল পুনর্ব্যবহার করার চালু ব্যবস্থাটা বদলে গেল। কোকাকোলা এবং পেপসি-র খালি বোতলে পরিবেশদূষণ হতে লাগল। বছর দুয়েক আগে সেন্ট্রাল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড কোকাকোলা, পেপসি ও বিসরেলি-র জরিমানা ধার্য করল কারণ তাদের পানীয়ের খালি বোতল যা কোম্পানিগুলির সংগ্রহ করে যথাযথভাবে সেগুলিকে বর্জ্য হিসেবে পুনর্ব্যবহারযোগ্য করার কথা ছিল তা তারা মানেনি। এখন চাপে পড়ে কোকাকোলা বলছে ২০৩০-এর ভেতর তারা তাদের বর্জ্য বোতল পুরোপুরি পুনর্ব্যবহার করার ব্যবস্থা করতে পারবে। ঘটনা হল কোকাকোলা, পেপসি ও নেসলে পৃথিবীর প্রথম পাঁচ পরিবেশদূষণকারী সংস্থার ভেতর রয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে গত বছর ইজিপ্টে কপ ২৭ আয়োজন করতে কোকাকোলা ছিল প্রধান সাহায্যকারী সংস্থা। তা নিয়ে কম হৈচৈ হয় নি। পরিবেশবান্ধব গোষ্ঠী থেকে বলা হয় এই সাহায্য কোকাকোলা-র মুখ বাঁচানোর চেষ্টা। কারণ ইতিমধ্যে সংস্থাটি পৃথিবীর এক নম্বর পরিবেশদূষণকারী বলে চিহ্নিত। তবে এটা বোঝা যাচ্ছে প্লাস্টিক দূষণ বন্ধ করা জরুরি। আর তার জন্য কিছু বাধ্যতামূলক পদক্ষেপ এখুনি নেওয়া দরকার।

খবরে প্রকাশ সিঙ্গাপুর পার্লামেন্ট হালকা-পানীয় ও অন্য পানীয়ের ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম চালু করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এপ্রিল ২০২৫ থেকে পানীয়র যা দাম তার ১০ শতাংশ বেশি দিয়ে কিনতে হবে। তবে প্লাস্টিক বোতল ও টিনের কৌটো ফেরত দিলে বাড়তি মূল্য ফেরত পাওয়া যাবে। পুনর্ব্যবহার করার ক্ষেত্রে এই পদক্ষেপ সিঙ্গাপুর সরকার চালু করতে চলেছে। বোতল ও পানীয়ের টিনগুলো ভেন্ডিং মেশিন থেকে পাওয়া যাবে আর খাওয়ার পর সেগুলি ফের সেই মেশিনেই ঢুকিয়ে দিলেই বাড়তি মূল্য ফেরত পাওয়া যাবে। দেশের সব সুপারমার্কেটে প্রায় ৪০০ ভেন্ডিং মেশিন বসানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে। সিঙ্গাপুরে এই ব্যস্থা চালু করে শতকরা ৮০ ভাগ খালি বোতল পুনর্বব্যহার করা যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে অতটুক দ্বীপরাষ্ট্রে যা সম্ভব ভারত বা চীনের মতো জনবহুল ও বড় দেশে সেরকম ব্যবস্থা কী আদৌ চালু করা যাবে! দূষণ ঠেকাতে পৃথিবীর আর সব দেশে এরকম ব্যবস্থা চালু হলে কোকাকোলা ও পেপসির মতো দূষণকারী সংস্থাকে বিকল্প ব্যবস্থা ভাবতে হবে। সূত্র — দি স্টেটসম্যান ২৩.৩.২০২৩ উ মা

সংগঠন সংবাদ

ইন্ডিয়া মার্চ ফর সায়েন্স, কলকাতা অর্গানাইজিং কমিটির ডাকে গত ৩১মে ২০২৩-এ রাজাবাজার সায়েন্স কলেজের মেঘনাদ সাহা অডিটোরিয়ামে একটি কনভেনশনের আয়োজন করা হয়। সভার মূল উদ্দেশ্য ছিল ডারউইনের বিবর্তনবাদ তত্ত্বকে স্কুল-পাঠক্রম থেকে বাদ দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো এবং এনসিইআরটি-র এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করা। প্রায় সারা ভারতবর্ষ জুড়েই বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষাবিদ এবং বিজ্ঞানীরা প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন বলে উদ্যোক্তারা জানান। অধ্যাপক পার্থপ্রতিম মজুমদার ও অধ্যাপক সৌমিত্র ব্যানার্জী স্কুলপাঠ্যে কেন ডারউইন-এর মতবাদ থাকা জরুরি তা নিয়ে বিশদে আলোচনা করেন। এই কনভেনশন ডাকার উদ্দেশ্য কী তা নিয়ে একটি লিখিত প্রস্তাবও বিলি করা হয়। তাতে বলা হয়েছে, লেখাপড়ার মৌলিক উদ্দেশ্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা, আর এর জন্য ডারউইনের বিবর্তনবাদ সকলেরই ডানা প্রয়োজন। দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েই আমাদের দেশে বহু ছাত্রই পড়া ছেড়ে দেয়। পরবর্তী ধাপে অল্প ছাত্র বিজ্ঞান পড়ে, তারও সামান্য ভগ্নাংশ জীববিজ্ঞান পড়ে। স্বভাবতই, মাধ্যমিক স্তরে ডারউইন তত্ত্বের সাথে পরিচয় না ঘটলে অনেকেরই এটা জানা হবে না, দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে বড়সড় ফাঁক থেকে যাবে। এই সভা আরও মনে করে, এই সিদ্ধান্ত কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বরং বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্ল্যাটফর্ম থেকে আজগুবি নানা দাবি, ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম-এর নামে প্রাচীন ভারতের কাল্পনিক গৌরবগাথার প্রচার, ইতিহাসের মনগড়া পুনর্লিখন, গো-বিজ্ঞান, জ্যোতিষকে পাঠসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার সাথে ডারউইনের মতবাদ ছেঁটে ফেলা একসূত্রেই গাঁথা। দেশে বৈজ্ঞানিক চিন্তা, যুক্তিবাদকে ধ্বংসসাধন করাই এর লক্ষ্য।

আলোচনা শেষে প্রশ্নোত্তর পর্বটিও বেশ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। সভার সঞ্চালক অধ্যাপক পলাশবরণ পাল সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন ও উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভায় উপস্থিতির হার ছিল লক্ষণীয়। বিভিন্ন রাজ্যে এরকম কনভেনশন আয়োজিত হয়েছে এবং আগামী দিনে পরবর্তী পদক্ষেপ ঘোষণা করা হবে বলে উদ্যোক্তারা জানালেন।

উ মা

বিশেষ ঘোষণা

উৎস মানুষ শুরু থেকেই পত্রিকায় প্রকাশিত কোনো একটি লেখা সমমনোভাবাপন্ন বন্ধু সংগঠন পুনর্মুদ্রণের জন্য আবেদন করলে তাতে সম্মতি দিয়ে এসেছে। পূর্ব শর্ত হিসেবে উৎস মানুষকে স্বীকৃতি দিয়ে সেই লেখাটির পুনর্মুদ্রণের অনুমতি দেওয়া হয়। সাধারণত একটি নির্দিষ্ট নিবন্ধের জন্য তা দেওয়া হয়। একাধিক নিবন্ধের জন্য অনুমতি দেওয়া হয় না। নিবন্ধের লেখকও সেই অনুমতি দিতে পারেন না।

লেখক-প্রকাশক-পাঠকদের কাছে বিশেষ অনুরোধ তাঁরা যেন কোনোভাবেই উৎস মানুষ পত্রিকার এবং উৎস মানুষ প্রকাশনার বই-এর কোনো লেখা পরিচালকমণ্ডলীর বিনা অনুমতিতে পুনর্মুদ্রণ না করেন। কারণ তা একপ্রকার বেআইনি কাজ। প্রয়োজনে সরাসরি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন যাতে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়ানো যায়।

উৎস মানুষ **WB/EC 228 ISSN 0971-5800 RN. 37375/80 Rs. 30.00**

৪৩ বর্ষ ৩য় সংখ্যা জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩ ৩০.০০ টাকা

উৎস মানুষ পত্রিকা ও প্রকাশনার বইয়ের জন্য যোগাযোগ— সুমন্ত বিশ্বাস।
ফোন— ৯৪৩৩৭৭১৫৭৭/৯১৪৩৭৮৬১৩৪

উৎস মানুষ পত্রিকা ও প্রকাশনার বইগুলি অনলাইনে অর্ডার দিলে পাওয়া যায়। যোগাযোগ—হারিত বুকস (অনলাইন) **haritbooks@gmail.com**
হারিতের ফোন নং — +৯১ ৮৩৩৬৯৪১১০৮

গ্রাহক চাঁদা (বাৎসরিক) ১৫০ টাকা (চারটি সংখ্যার জন্য) উৎস মানুষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়া যায়। স্পিড পোস্টে নিলে ২২০ টাকা জমা দিতে হবে।

Punjab National Bank,
College Street Branch,
Kolkata - 700073.
UTSA MANUSH, SB ACCOUNT NO. 0083010748838. IFSC NO. PUNB0058400

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দিয়ে ফোনে বা ই-মেলে নাম, ঠিকানা, পিনকোড, ফোন নং ও ই-মেল দেবেন আর কোন সংখ্যা থেকে গ্রাহক হবেন তা জানাবেন। সাধারণ ডাকে পত্রিকা পাঠানো হয়। ডাকে পত্রিকা না পেলে আমরা সংখ্যাটি দ্বিতীয়বার পাঠাতে পারব না। গ্রাহক নবীকরণ একইভাবে করা করা হয়।

ওয়েবসাইট : **https://www.utsomanush.com**
ই-মেল : **utsamanush1980@gmail.com**
Facebook : https://www.facebook.com/

পুস্তক তালিকা

স্বাস্থ্যের সাতকাহন : গৌতম মিস্ত্রী	২৫০.০০
আসুন কাণ্ডজ্ঞানে ফিরি: আশীষ লাহিড়ী	৮০.০০
চেনা বিষয় অচেনা জগৎ: সমীরকুমার ঘোষ	১৫০.০০
বাঁধ বন্যা বিপর্যয় (সংকলন)	২০০.০০
আহরণ (সংকলন)	২০০.০০
যে গল্পের শেষ নেই: দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	১৫০.০০
প্রতিরোধ : সম্পা: (ঐ)	১০০.০০
বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান (সংকলন)	২০০.০০
বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ (সংকলন)	১৫০.০০
বিবেকানন্দ অন্য চোখে/সমীক্ষা ও আরো কিছু বিতর্ক	
নিরঞ্জন ধর	১২০.০০
প্রমিথিউসের পথে (সংকলন)	৫০.০০
লেখালিখি: অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়	২০০.০০
যুক্তিবাদের চার সেনাপতি	
অনু : প্রতুল মুখোপাধ্যায়	৬০.০০
শেকল ভাঙা সংস্কৃতি (সংকলন)	১২০.০০
গুমোট ভাঙ্গার গান: ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ	১৫০.০০
নিজের মুখোমুখি: রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	৫০.০০
এটা কী ওটা কেন (সংকলন)	৫০.০০
মূল্যবোধ (সংকলন)	৮০.০০
প্রেসিডেন্ট বুশ-এর এই যুদ্ধ:	
অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়	৩০.০০
তিন অবহেলিত জ্যোতিষ্ক:	
রণতোষ চক্রবর্তী	১৮.০০
বাংলা বন্ধ বা শেষের শুরু:	
হিমানীশ গোস্বামী	৪০.০০

প্রাপ্তিস্থান : বই-চিত্র (কফি হাউসের তিন তলা, দুপুর ৩টে-সন্ধ্যে ৭টা), পাতিরাম, বুকমার্ক, অমর কোলে (বিবাদী বাগ), সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়), মনীষা গ্রন্থালয় (কলেজ স্ট্রীট), ক্রান্তিক (কলেজ স্ট্রীট), রথীনদা (গোলপার্ক). ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (সূর্য সেন স্ট্রীট) । জ্ঞান বিচিত্রা ১৮বি/১বি, টেমার লেন। সেতু প্রকাশনী ২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,কল-৭৩ (কফি হাউসের পাশের গলি)। হারিত বুকস (অনলাইন) **haritbooks@gmail.com**

উৎস মানুষ সোসাইটির পক্ষে বরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক বি ডি ৪৯৪, সল্টলেক, কলকাতা- ৭০০ ০৬৪ থেকে প্রকাশিত এবং দি নিউ জয়কালী প্রেস, ৮এ, দীনবন্ধু লেন, কলকাতা- ৭০০ ০০৬ হইতে মুদ্রিত।

This document was created with the Win2PDF “Print to PDF” printer available at

https://www.win2pdf.com

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.
Visit https://www.win2pdf.com/trial/ for a 30 day trial license.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

https://www.win2pdf.com/purchase/